আমরা
ও
ফেলুদা
e-নববর্ষ সংখ্যা
১৪২৩
FFC

e-নববর্ষ সংখ্যা ১৪২৩

http://facebook.com/groups/feluda.3musketeres

e-নববর্ষ সংখ্যা ১৪২৩

শুভ নববর্ষ ১৪২৩

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

বিশেষ আকর্ষণ

বড় গল্প

ছোট গল্প

প্রবন্ধ

ছড়া-কবিতা

তুলির টানে

প্রেমের সফর - স্বর্ণেন্দু ভট্টাচার্য্য

সুপ্ত স্বপ্ন - স্বর্ণেন্দু ভট্টাচার্য্য

টম এন্ড জেরি - দীপান্বিতা ভট্টাচার্য

আলোক চিত্র

বুদ্ধদেব গুহ'র উপন্যাসের পটভূমিতে - চিরঞ্জীৎ দাস

গান দরিয়া - সৌম্যদীপ পাল

নতুন বছরে দেখো নতুন সূর্যোদয় - সৌম্যদীপ পাল

ও নদীরে - শুভঙ্কর ঘোষ

জয় বাবা ফেলুনাথ - শুভঙ্কর ঘোষ

প্রয়াগের পুন্য তোয়া - শুভঙ্কর ঘোষ

মঙ্গলালোকে - শুভঙ্কর ঘোষ

অলি গলি চলি রাম - সাখাওয়াত ইসলাম

জীবনের পথ চলা - সাখাওয়াত ইসলাম

মধুচোর - সাখাওয়াত ইসলাম

প্রচ্ছদ

অর্ক চক্রবর্তী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই ম্যাগাজিনে ব্যবহৃত বিভিন্ন ডিজাইন ও ইলাস্ট্রেসানগুলি নেট থেকে সংগ্রহ করে ব্যবহার করা হয়েছে। ইহাদের আর্টিস্ট এবং আপলোডারদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

e-নববর্ষ সংখ্যা ১৪২৩

সম্পাদকমণ্ডলী

প্রকাশক

ফেলুদা ফ্যান ক্লাব

ফেলুদা ফ্যান ক্লাবের পক্ষ থেকে
ডিজিটাল পিডিএফ ফরম্যাটে
প্রকাশিত ও সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

স ম্পা দ কী য়

আমাদের কথা

ফেলুদা ফ্যান ক্লাবের মাননীয় সদস্যবৃন্দ, ভাই বোনেরা ও গুরুজনেরা,

বাংলা নববর্ষ ১৪২৩-এর প্রারম্ভে আবার আমরা আপনাদের সমক্ষে প্রস্তুত করছি আমাদের গ্রুপের অন্তর্জাল পত্রিকার নববর্ষ সংখ্যা। বরাবরের মতো আশা রাখি যে নববর্ষ ১৪২৩ সংখ্যাও আপনাদের মনোরঞ্জনে সক্ষম হবে ও আপনাদের স্নেহ ও আশীর্বাদ লাভ করবে।

ফেলুদার আবির্ভাবের পর অর্ধশতাব্দী কেটে গেল। এই পঞ্চাশ বছরে অন্তত তিনটে প্রজন্ম ফেলুদাকে নিয়ে মেতে থেকেছে। আর ফেলুদার সাথে সমান তালে সঙ্গত করে গেছেন জটায়ু ও তোপসে। গোয়েন্দা গল্পের ভক্ত বাঙালিদের কাছে এই ত্রিরত্ন হলেন চিরতরুণ চিরনতুন চিরসবুজ। যে নায়ককে আমরা আমাদের জীবনে ও স্বপ্নে খুঁজে বেড়াই ফেলুদা হলেন সেই নায়ক। তাই সময় বাঙালির ফেলুদা প্রেমকে ভোলাতে পারল না। নতুন নায়কদের ভিড়ও ফেলুদাকে হারিয়ে যেতে দিল না। ফেলুদা নিজের দুই সঙ্গীকে নিয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছেন কালোত্তীর্ণতার পথে। ফেলুদার কাহিনীগুলি কিন্তু শুধু নিছক গোয়েন্দা গল্পই নয়। এর মধ্যে স্থান পেয়েছে আরো নানা রকমের বিষয় বস্তু যা কিনা শুধুমাত্র বৈচিত্র্যের জোরে আমাদের মুগ্ধ করে। সুন্দর মনোরঞ্জনের নানা উপাদান ছড়িয়ে আছে ফেলুদা-কাহিনীগুলির মধ্যে। আবার ফেলুদাও নিজের পেশা গোয়েন্দাগিরির বাইরে নানা রকম বিষয় নিয়ে চর্চা করেছেন।

তাই সেই কথা মাথায় রেখে আমরাও সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি নানা রকম আকর্ষণীয় বিষয় দিয়ে আমাদের পত্রিকাকে সাজাতে, যাতে কিনা সবাই নিজের নিজের পছন্দের কোনও না কোনও বিষয় এই পত্রিকায় খুঁজে পান। বিনীত অনুরোধ শুধু একটাই – ভুলত্রুটি যদি কিছু আপনাদের চোখে পড়ে তাহলে তা নিজগুণে ক্ষমা করে আমাদের যেন একবার তা জানিয়ে দেন। আমরা নিশ্চয় আমাদের ভুল ত্রুটি পরের বার সংশোধন করে নেব। নববর্ষ ১৪২৩ আপনাদের সবার কাছে মঙ্গলময় হয়ে উঠুক এই প্রার্থনা জানাই। আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে ১৪২৩ এর শারদোৎসবে।

বিনয়াবনত

ফেলুদা ফ্যান ক্লাব নিবেদিত
নববর্ষ ১৪২৩ পত্রিকার
সম্পাদক / সম্পাদিকা বৃন্দ

পয়লা বৈশাখ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

শুভ নববর্ষ

১৪২৩

ফেলুদা ফ্যান ক্লাবের পক্ষ থেকে সবাইকে
বাংলা নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি,
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

https://facebook.com/groups/feluda.3musketeres

অগ্নিভ চক্রবর্তী

এক গোয়েন্দার গল্প বলছি মন দিয়ে তাই শোন,
মগজাস্ত্র, ৩২ কোল্ট দুটি অস্ত্র তাঁর জেনো।
লম্বা ৬ ফুট বুদ্ধি প্রখর প্রদোষ মিত্র নাম তাঁর
এই সময়ে আমাদের তাই ফেলুদাকেই দরকার !

স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক জটায়ু-লালমোহন,
তপেশ মিত্র বলে থাকেন ফেলুদার সাতকাহন।
(প্রায়) কোন কেসেই ফেল করেন না ভীষণ নামডাক তাঁর
এই সময়ে আমাদের তাই ফেলুদাকেই দরকার !

সন্দেশে বা পূজাসংখ্যায় দেখা দিত সে
ফেলুদা ঠিক দেবে সন্ধান অপরাধী কে ?
বেড়াতে গেলেই রহস্য তাকে ঘিরে ধরে বারবার
এই সময়ে আমাদের তাই ফেলুদাকেই দরকার !

লন্ডন হোক বা লখনউ ফেলুদা যেখানেই যাক
প্রদোষ মিত্র নামটা শুধু চিরসবুজ হয়ে থাক
দেখতে দেখতে ফেলুদার আজ ৫টা দশক পার
এই সময়ে আমাদের তাই ফেলুদাকেই দরকার !

নতুন ফেলু-গল্প আর আমরা পড়তে পারি না হায়
সেলাম তোমায় মহারাজা, সেলাম সত্যজিৎ রায় !
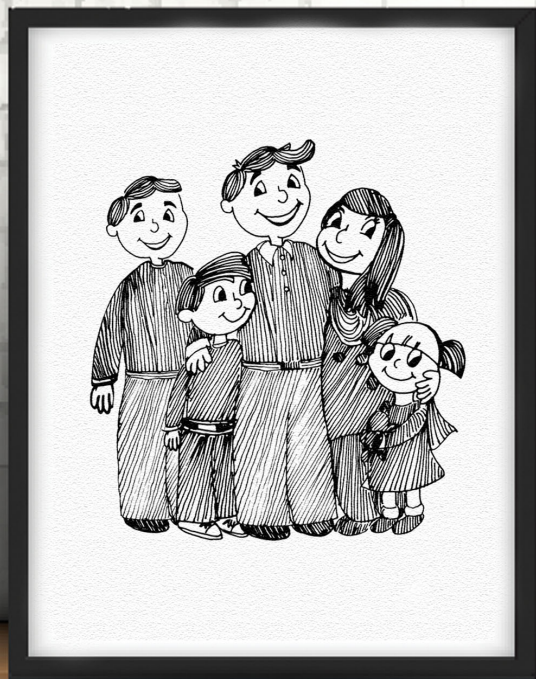
কালনেমির লঙ্কাভাগ

অনন্যা দাশ

জিকো কেকা মামার অফিসে গেছে। মামা ওদের অফিসে বসিয়ে চট করে কি একটা কাজ সেরে আসতে গেলেন। তারপর ওদের গাড়ি করে নিয়ে রায়চকের পথে রওনা হবেন। ব্যস্ত একটা ল' ফার্মে কাজ করেন মামা। অফিসটা ছোট কিন্তু সুন্দর করে সাজানো। জিকো বলল অফিসে সব কিছু ভাল শুধু ওই ছবিটা ছাড়া ! মামা যেখানে বসেন তার সামনেই সুন্দর একটা ফ্রেমে বাঁধানো রয়েছে কেকার আঁকা একটা ছবি। সেটা যখন সে এঁকেছিল তখন ওর বয়স চার কি পাঁচ হবে। সেই বয়সের যেমন আঁকা হয় সেইরকম। মা, বাবা, জিকো, কেকা আর মামা সবাইকে

এঁকেছে কেকা।

মামা কাজ সেরে ঘরে এসে ঢুকতেই জিকো বলল, "মামা তুমিও না ! এত সুন্দর সাজানো অফিসে কেকার ওই বিশ্রী আঁকাটা কেন রেখেছ ! আমি তোমাকে ওর চেয়ে ঢের ভালো ভালো আঁকা দিয়ে দিতে পারি ! আমাদের ড্রয়িং স্যার তো ফাটাফাটি আঁকেন, ওনার কাছ থেকে কিছু নিতে পার। ওই কাঠির ওপর আলুর দম লোকজনের ছবি রাখার কোনও মানে হয় !"

মামা হাসলেন, "ওটা যে সে ছবি নয় ! ওই ছবিটার আমার জীবনে বিশাল মাহাত্ম্য ! চল পথে যেতে যেতে বলছি! তোমরা রেডি তো ?"

দূরের রাস্তা কিন্তু মামার বন্ধু সৌগত মামা চালাচ্ছেন তাই মামার কোনও টেনশন নেই, গল্পটা বলতে শুরু করলেন মামা।

"এটা বেশ কিছুদিন আগেকার কথা। তখন আমি সবে কাজে ঢুকেছি। সেটা অন্য একটা ল' ফার্ম মিস্ত্রি অ্যান্ড সন্স বলে। সুরজমল মিস্ত্রি নামকরা উকিল। তাই ওনার বেশ কিছু খুব বড়লোক ক্লায়েন্ট ছিল। সেই রকমই একজন ছিলেন রতনলাল দেশমুখ। বিশাল বড়লোক ছিলেন। হঠাৎ মারা গেছেন। ওঁনার উইলের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হচ্ছে মিস্ত্রি অ্যান্ড সন্স। তিন ছেলে ওঁনার রমেশ, উমেশ আর সোমেশ। একদিন আমি অফিসে গিয়ে শুনি প্রচন্ড বচসা চ্যাঁচামেচি একেবারে হুলুস্থুল কান্ড। তদ্দিনে মিস্টার মিস্ত্রির ছোট ছেলে সাকেতের সঙ্গে আমার মোটামুটি বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "কি ব্যাপার ভাই এত চিৎকার চ্যাঁচামেচি কেন ?"

সে বলল, "রউসোরা এসেছে আবার কি ! ওরা এলে তো এইরকমই হয় !"

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, "রউসো কে ?"

"আরে রতনলাল দেশমুখের তিন ছেলে রমেশ, উমেশ আর সোমেশ ! একেবারে সাপে নেউলে সম্পর্ক !"

"ও, তা কি নিয়ে ঝগড়া ?"

"রতনলাল মারা গেছেন। ওঁনার উইল নিয়ে ঝগড়া। ওঁনারও বলিহারি যাই ! সবসময় ছেলেগুলোকে যেন ঝগড়া করতে বাধ্য করতেন ! ওরা খেয়োখেয়ি করছে দেখে যেন আনন্দ পেতেন খুব ! মানুষ যে কতরকম হয় ! সব বাবার ঘরেই আছে ! তুমি যাও এই কাগজটা সই করিয়ে নিয়ে এসো তাহলেই দেখতে পাবে ! তারপর আরও বিস্তারিত বলছি। আসলে এই কাগজে সইটাও দরকার। আমি যাচ্ছি না, আমাকে দেখলেই আমারও মাথা খাবে তিনজনে !"

আমি কাগজটা নিয়ে মিস্টার মিস্ত্রির অফিসে গিয়ে দরজায় টোকা দিলাম। উনি কাম ইন বলতে ঢুকলাম। তিন জোড়া চোখ আমার দিকে তাকিয়ে দেখল। কোনটা কে বলে দিতে হল না। বড় ছেলে রমেশের বয়স বেশ কিছুটা বেশি। গাঢ় নীল থ্রি পিস স্যুট টাই ইত্যাদি পরে ফিটফাট। মেজ ছেলে উমেশ শার্ট প্যান্ট পরে আছে আর ছোট ছেলে সোমেশ পাঞ্জাবি পাজামা পরা মুখে সিগারেট, একেবারেই যেন কোন ভ্রুক্ষেপ নেই টাইপের মুখের ভাব। যাই হোক আমি তো কাগজে সই করিয়ে নিয়ে চলে এলাম।

সাকেত আমাকে থ্যাঙ্কস ট্যাঙ্কস দিয়ে বলল, "রতনলাল দেশমুখের প্রচুর অর্থ ছিল তাই উনি নামী দামি আর্টিস্টদের ছবি কিনতেন। ওঁনার কাছে ১৭টা খুব দামি ছবি আছে তার মধ্যে এম. এফ. হুসেন, যামিনী রায়, অমৃতা শেরগিল ইত্যাদি। দাম মোটামুটি এক রেঞ্জেই। তা হবি তো হ, সে কিনা উইলে লিখে গেছে আমার সম্পত্তির অর্ধেক পাবে রমেশ ও-ই বাবাকে এতদিন দেখাশোনা ইত্যাদি করেছে বলে, ১/৩ ভাগ পাবে উমেশ আর ১/৯ ভাগ পাবে সোমেশ কারণ সে শুধু ফুর্তি করে বেড়িয়ে বাবার পয়সা উড়িয়েছে ! বাকিটা চ্যারিটিতে যাবে। তা এখন বাকি সব তো ভাগ হয়ে যাবে, সমস্যা হয়েছে ওই ১৭ টা ছবিকে নিয়ে ! ওগুলো এতটাই দামি যে কেউ কাউকে এতটুকু বাড়তি ছাড়তে রাজি নয় ! ফলে রমেশ ৮.৫ ছবি নিয়েই ছাড়বে, উমেশের ৫.৬ চাই আর বাকিটা সোমেশ। এখন আমার বাবা বেচারা ওই সব ছবিটবি খুব ভালবাসেন। একটা অত দামি ছবিকে মূর্খগুলো কুটিকুটি ছিঁড়ে দেবে সেটা উনি সহ্য করতে পারছেন না। সেই সকাল থেকে ওদের বোঝাচ্ছেন যাতে কেউ নিজের অর্ধেকটা ছাড়ে কিন্তু কেউ রাজি নয় ! ওই শোনো !"

আমি কান পেতে শুনলাম। রমেশ দেশমুখ চেঁচাচ্ছেন, "আমি মহাভারতের কথানুযায়ী এই টুকুনই বলতে পারি ছুঁচের ডগাতে যেটুকুনি মাটি ধরে আমি সেটা ছাড়তেও রাজি নই ! বুড়ো বয়সে বাবা মার দেখাশোনা কে করেছে ? ডক্টর রিহ্যাব অপারেশান সব আমার ঘাড়ের উপর দিয়ে গেছে তখন এরা কেউ এসেছিল আমার কষ্ট শেয়ার করতে ! এখন

শেয়ারিং দেখাচ্ছে ! সোমেশ ব্যাটা তখন মরিশাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে !"

সোমেশ বলল, "ভাল জায়গা দাদা একবার ঘুরে আসিস। তোর মেজাজ ঠান্ডা হবে। তোর পরিবারের লোকজন তোকে সহ্য করে কি করে কে জানে !"

"তুই থামবি ! হতভাগা কামচোর কোথাকার !"

উমেশ দেশমুখ এবার যোগ দিলেন, "নাহ আমিও একচুল ছাড়তে রাজি নই ! সোমেশের যা হাল ওকে কিছু ছেড়ে দেওয়া মানে পুরো ফুকে দেবে ! এই তো এই ছবিটাকে হাফ করে নেওয়া যাবে। এদিকে কিছু মানুষ ওদিকে কিছু মানুষ। আমি সিওর তারপর আলাদা করে ফ্রেম করে নিলে এটাকে দুটো ছবি বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে।"

বাকি দুজনে তাতে রাজি, বলল "হ্যাঁ হ্যাঁ ছোট সাইজের ছবির জন্য আর কিছু না হোক অর্ধেক দাম পাওয়া যাবে। লুকমানকে দিয়ে ভাল করে বাঁধিয়ে নিলেই হবে।"

এর মধ্যে মিস্টার মিস্ত্রির দুঃখে ভেঙে পড়া কণ্ঠে এল, "না না এই অসাধারণ ছবিটাকে আপনারা টুকরো করবেন না প্লিজ ! আমাকে একটু সময় দিন !"

"সময়টাই তো নেই আমাদের হাতে ! আমাকে পরশু ফিরতে হবে নাগপুর। উমেশ গাঁই-গুঁই করল।"

মিস্টার মিস্ত্রি প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললেন, "কাল সকাল পর্যন্ত সময় দিন আমাদের ! আমরা ঠিক কিছু একটা করব। আমাকে এখন কোর্টে যেতে হবে আধ ঘন্টার মধ্যে, আজকে তাই আর কিছু হবে না !"

সেদিনকার মতন তিন ভাই চলে গেল। মিস্টার মিস্ত্রির মোটেই কোর্টে যাওয়ার ছিল না, উনি ওদের তাড়ানোর জন্য মিথ্যে কথা বলছিলেন ! ওরা যেতেই স্যারিডন খেলেন, বললেন, "এই তিন ভাই আমাকে পাগল করে দেবে, এম. এফ. হুসেন, যামিনী রায়, রবি ভার্মার অরিজিনাল ছবি এরা টুকরো করে দেবে ভাবতে পার ! কিন্তু এদের আটকাব কী করে ? মিস্টার দেশমুখেরও মাথাটা খারাপ ছিল ! সব সময় এদেরকে কুত্তা বিল্লির মতন লড়তে দিতেন ! একেবারে যাচ্ছেতাই !"

সেদিন বাড়ি ফিরে দেখি কেকারানি ওই মাস্টারপিসটা এঁকেছে । আমাকে বলল, "মামা তোমার জন্য এঁকেছি !" ওটা দেখেই আমার মাথায় ধাম করে একটা আইডিয়া এল ! আমি তখন একদম জুনিয়র কর্মী। মিস্টার মিস্ত্রিকে ফোন করার সাহস আমার নেই তাই আমি সাকেতকে ফোন করে বললাম আমি একটা সমাধান পেয়েছি সেটা আমাকে ওনারা পরীক্ষা করতে দেবেন কিনা। দেশমুখ ভাইরা যদি আমার সমাধানে রাজি হয় তাহলে ছবি ছেঁড়ার আর দরকার হবে না। সাকেত মিস্টার মিস্ত্রিকে ফোন করে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে কল করে বলল, "একদম। ওদের কোনও আপত্তি নেই।"

আমি সঙ্গে সঙ্গে কেকার ছবিটাকে নিয়ে পাড়ার বাঁধাইয়ের দোকানে গিয়ে বাড়তি পয়সা দিয়ে তক্ষুনি ওটাকে সুন্দর করে বাঁধাই করালাম।

পরদিন আমি কেকার ছবি কাগজে মুড়ে বগলদাবা করে নিয়ে অফিসে গেলাম। একটু পরেই তিন ভাই এসে হাজির। মিস্টার মিস্ত্রি আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি ছবিটা নিয়ে ওনার ঘরে গেলাম। ১৭ টা ছবি সারি দিয়ে রাখা। অসাধারন ছবিগুলো দেখলে মনে হয় দেখতেই থাকি। বুঝলাম কেন মিস্টার মিস্ত্রি ওর একটাকে টুকরো করে ফেলাতে এত দুঃখ পাচ্ছেন। আমার ছবির মোড়ক খুলে সেটাকে ওই সব মাস্টারপিসের পাশে রাখলাম। তারপর বললাম, "দেখুন আমরা তো আপনার বাবার সম্পত্তি বা উইলের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বা এগ্‌জিকিউটর তাই আমরা আমাদের তরফ থেকে ওনার কালেকশানে এই ছবিটা জুড়লাম। তাহলে এখন রতনলালজির ছবির সংখ্যা দাঁড়ালো ১৮। রমেশজি আপনি অর্ধেক পাবেন, অর্থাৎ ৯ টা ছবি। খুশি তো আপনি ? ঊমেশজি আপনি পাবেন ১/৩ ভাগ, তাই ৬ টা ছবি, কোনো কাটাকুটির দরকার নেই, আর সোমেশজি আপনি পাবেন ১/৯ ভাগ, তাই দুটো ছবি। তাহলে রমেশজি ৯, উমেশজি ৬ আর সোমেশজি ২ মানে ১৭, পড়ে থাকল একটা, অর্থাৎ আমার দেওয়া মাস্টারপিসটা। সেটা আমি নিচ্ছি যদি না আপনারা কেউ নিয়ে আমাকে একটা হুসেন বা যামিনী রায় দিতে চান !" বলে আমি হাসতে লাগলাম ! ওনারা তিনজন প্রচন্ড খুশি হয়ে ছবি নিয়ে চলে গেলেন। মিস্টার মিস্ত্রি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন ওরা চলে যাওয়ার পর। বললেন, "তুমি আমাদের দেশের অমূল্য সম্পদগুলোকে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করলে !" ওই ঘটনার পর আমার মাইনে টাইনে বেড়ে গিয়েছিল। যাক এবার বুঝলি তো কেন আমি কেকার ওই আঁকাটাকে দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখি। অনেক মধুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে ওটার সঙ্গে যে সে তোর স্যার যতই ভাল আঁকুন না কেন ওই ছবি আমার অফিসের দেওয়াল থেকে সরছে না !" ♦♦♦

বুদ্ধদেব গুহ'র
উপন্যাসের পটভূমিতে

চিত্রগ্রাহক - চিরঞ্জীৎ দাস

কোয়েলের কাছে

একটু উষ্ণতার জন্য
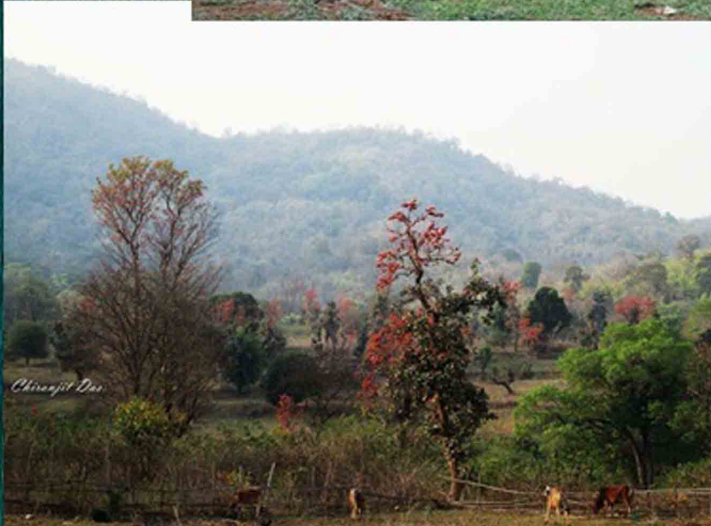
কোজাগর
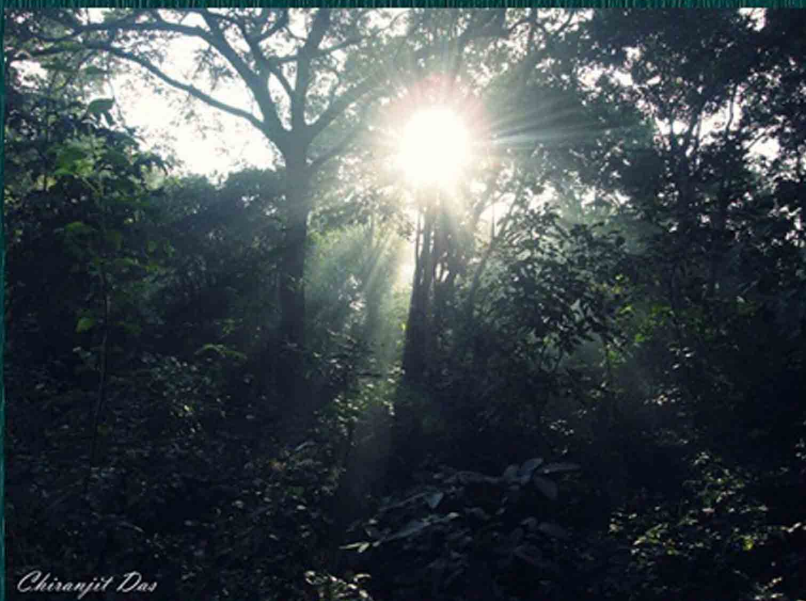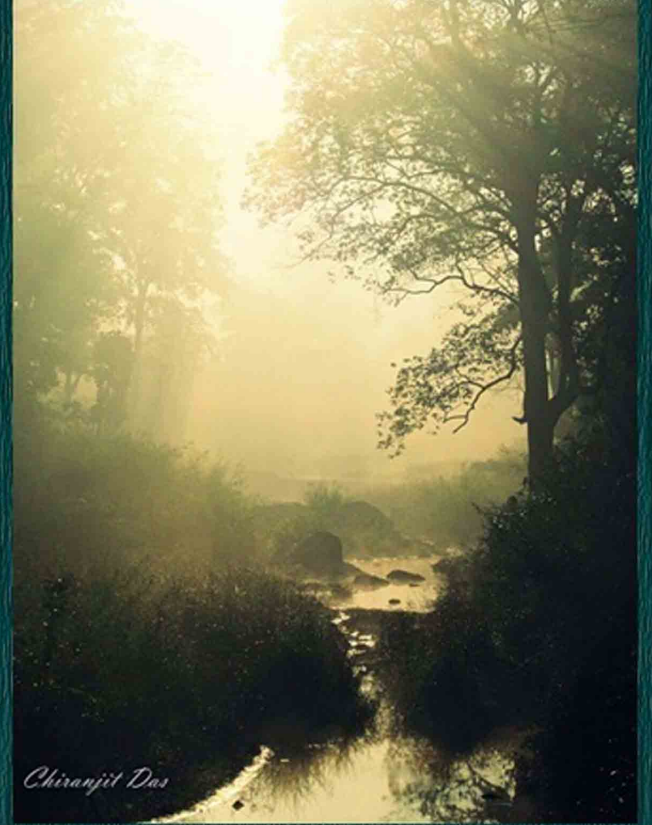
সবিনয় নিবেদন

কালবৈশাখী বেলায়...

দীপাঞ্জনা সাহা

আজ কাল বৈশাখী বেলায়
ডাক পিওনের শেষ চিঠির
খোঁজ, আমার ভাঙা জানালায়।
আমি তখন
মেঘেদের রহস্যজালে আবৃত
ভাঁজ খুলে চোখ রাখি
সাদা কাগজে,
আমার পাশে বিদ্যাপতি থাকে, চণ্ডীদাস থাকে
মাঝে সাঝে তুমি থাকলেও পারো।

আজ কালবৈশাখী বেলায়
সদ্যজাত মুকুল ঝরে পড়ে
আর্তনাদে, হাসিমুখে জানায় বিদায়।
আমি তখন,
অর্ধশূন্য মাতৃকোলে মুখ ঢাকি
আলতো ঠোঁট ছুঁয়ে দেখি
ওদের কপালে,
আমার সাথে মিয়াজাকি-শক্তি অপেক্ষা করে,
কখনও সখনও তুমি করলেও পারো।

আজ কালবৈশাখী বেলায় ভাঙাচোরা বিশ্বাসে
মন আশ্রয়
খোঁজে, হাজার হাজার যৌবন শ্বাসে।
আমি তখন,
উপচে-পরা জলের প্রেমে মগ্ন
দুহাতে চেপে ধরি চোখ
বালিশের কাঁধে
আমার জন্য কাহলো কাঁদে, সুমন কাঁদে,
এক-আধবার তুমি কাঁদলেও পারো।
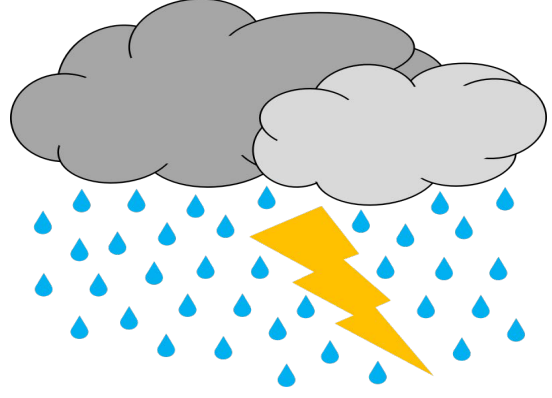
সত্যজিতের প্রতি

দীপান্বিতা ভট্টাচার্য

হে সত্যজিৎ, প্রণমি তোমারে,
প্রদীপের ন্যায় আলোর বিচ্ছুরণে সমৃদ্ধ করেছ সবারে।
দিয়েছ আমাদের ফেলুদার মত এক দাদা,
যেকোনো সমস্যায় যার কাছে গেলে সমাধান ধরাবাঁধা।
পরিচয় করিয়েছ আমাদের সাথে সেই সিধুজ্যাঠার,
যিনি পাশে থাকলে নিষ্প্রয়োজন গুগল সার্চ করার।
আরও পেয়েছি আমরা সবার প্রিয় তারিণীখুড়োকে,
যার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার আনন্দে ভরিয়েছে বহু গ্রীষ্মের দুপুরকে।
প্রফেসর শঙ্কুর আবিষ্কার আর বিজ্ঞান-ভাবনা,
কত ক্ষুদেকে দিয়েছে ভবিষ্যতে বিজ্ঞানী হওয়ার অনুপ্রেরণা।
জীবন্ত করে তুলেছ গল্পের অপু-দুর্গাকে চলচ্চিত্রের পর্দায়,
ভাইবোনের সেই অসাধারণ সম্পর্ক চিরস্থায়ী মনের মণিকোঠায়।
গুপী বাঘার গান, যাদু আর তাদের সারল্য,
তা যে আট থেকে আশি সকলের স্মৃতিতে তা বলাই বাহুল্য।
সাহিত্য জগৎ থেকে চলচ্চিত্রের আসরে,
আলোড়ন তুলেছ তুমি, তোমার সৃষ্টির সমাহারে।
শুধু বাংলা নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের তুমি গর্ব,
তোমার জীবনকাল আমাদের কাছে ইতিহাসের এক সুবর্ণ পর্ব।
তাই, কবির ভাষাতেই বলি, 'ফুরায় যা তা ফুরায় শুধু চোখে',
তোমার সৃষ্টির মাঝে তুমি চির-অমর, অনুপস্থিত থেকেও সম্মুখে।

গল্প

সবুজ গ্রহের সবুজ মানুষ

সহেলী চট্টোপাধ্যায়

আমার মোবাইল নিজের ইচ্ছামত চলে। আমার সাধ্য কি তাকে চালানোর ! ব্যাপারটা প্রথম প্রথম পাত্তা দিই নি। ভাবতাম টাচ স্ক্রিন তাই চালাতে অসুবিধা হচ্ছে। দু'দিনে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু দু'দিন ছেড়ে দু'বছর হতে বসেছে এখনও আগের মতোই আছে। মনে হয় না সে কোনও জড় পদার্থ। যত দিন যাচ্ছে সে তত বেগর-বাঁই করে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সে ভালই থাকে। এক এক সময় কী যে হয় তার ! দু'বার সে সার্ভিস

সেন্টার থেকে ঘুরে এসেছে। সেখানে সে দিব্যি ভালো ছেলের মতো ছিল। মেসেঞ্জার খুললে হোয়াটস অ্যাপ খুলে যায়। হোয়াটস অ্যাপ খুলতে গেলে মেসেঞ্জার। একসময় ক্যামেরা খুলতাম না। কারণ ওটা খুললে আর বন্ধ হতো না। মোবাইলের পেছনটা খুলে ফেলতে হতো, তারপর আবার লাগাতে হতো। এই পদ্ধতি তো বার বার ব্যবহার করা যাবে না। তাই ক্যামেরা বন্ধ থাকত। বেশ কয়েক মাস যাবত ক্যামেরা ভালো চলছে। বাজে ব্যাপার একদিন ঘটে গেল। মেসেঞ্জারে কথা বলতে বলতে একদিন ক্যামেরা খুলে গেল। পটাপট দু চারটে ছবি চলে গেল বন্ধুর মেসেজ বক্স-এ। হঠাৎ অন্ধকার ঘরের ফোটো দেখে সে তো অবাক আর আমি তার চেয়েও বেশি। ক্যামেরা বন্ধ করতে পারলাম না হাজার চেষ্টা করেও। প্রচণ্ড অবাধ্য হয়ে উঠেছে আমার ফোন। শেষ পর্যন্ত ওই একটাই ওষুধ। পেছনের অংশটা খুলে ফেলতে হল। আবার জোড়া লাগিয়ে অন করতেই কিন্তু ঠিক হয়ে গেল। আর এরকম বিপদে সে কখনও ফেলেনি।

আমার মোবাইল আমার বন্ধুদের হাতে থাকতে চায় না। ওরা কিছু করতে চাইলেও পারে না। তাই ওরা বার বার ই পরামর্শ দেয় ফোনটা বেচে দিয়ে নতুন একটা ফোন কেনার। আমার একটা মায়া পড়ে গেছে ফোনের প্রতি। তবে এবার কিছু একটা করতে হবে। সার্ভিস সেন্টারে দিলে তারা কোনও গোলমাল খুঁজে পায় না। বলে, বড় বড় কোম্পানির জিনিষে এরকম ছোটো ছোটো প্রবলেম হতেই পারে। আপনার জিনিস একদম ঠিক আছে।

মাঝ রাতে একদম অদ্ভুত রকম ফোন নম্বর থেকে ফোন আসাটাও বেশ রহস্যজনক। পরের দিন সকালে কল ব্যাক করলে তাতে রিংও হয় না। এবার মাঝ রাত্তিরে এলে অবশ্যই রিসিভ করব । আর একটা মজার কথা হল আমি ফোন না করলেও অনেক বন্ধু আমার মোবাইল থেকে মিসড কল পায়। নিজের কললিস্ট চেক করে দেখতাম অনেক সময় ডায়াল্ড কলে আমি কোন সময় মনের ভুলে ডায়াল্ড করে বসে আছি। হয়তো এটা টাচ প্রবলেম হতে পারে। কিন্তু মেসেঞ্জার খুললে পরে অন্য কোনও অ্যাপস খুলে যাওয়াটা বেশ অস্বস্তিকর। রঙ নম্বর হবার সম্ভাবনা থাকে।

আমার মোবাইল কেউ ব্যবহার করতে পারে না। না আমার মা, না আমার বন্ধুরা। খুব দুঃখজনক! কেউ কেউ ফোটো তোলার চেষ্টা করে আবার ফিরিয়ে দিয়ে যায়। আমি ভাই পারছি না এতে। এর চেয়ে বন্দুক চালানোও অনেক সহজ! কাউকে বিনা পয়সায় এটা দিলেও সে নেবে না। এই রকম মন্তব্য শুনতে শুনতে আমি ক্লান্ত। অপমান যে লাগে না তা নয়।

ফোন মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়ে যথেষ্ট চার্জ দেওয়া স্বত্ত্বেও। ওকে জাগানোর জন্য আবার ওর পেছনের ঢাকনা খুলে একটু মেরামত করে নিই। মনে হয় না একে সার্ভিস সেন্টারে দিই বা কাউকে বেচে দিই। থাকতে থাকতে কখন যেন আমার বন্ধুই হয়ে গেছে। শুধু মাঝে মাঝে একটু দুষ্টুমি করে ফেলে।

একদিন গভীর রাতে ফোনটা বেজে উঠেই থেমে গেল। নীল রঙের একটা আলো জ্বলছে দপ দপ করে। নীল আলো থেকে সবুজ, সবুজ থেকে লাল। হাতে নিতেই মনে হল মিহি স্বরে কেউ কিছু বলছে। যা ভেবেছিলাম তাই হয়েছে। কোনও আত্মা টাত্মা ঢুকে পড়েছে আমার সাধের মোবাইলে। ইস কী হবে এখন ? মিহি স্বর একটু জোরালো হল, আমরা ভূত নই। আমরা ভাইরাস। ভূত নয় শুনে আমার হারানো সাহস ফিরে এল। ভূত হলে বেশি খারাপ হতো। জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা কতজন আছ মোট ?

আমি আছি আর আমার বোন। একজন তোমার মোবাইলে, আর একজন তোমার ল্যাপটপে।

সে কি! ল্যাপটপেও আছ! ওই জন্যই এত খারাপ অবস্থা ওটার।

কী করব! ওপরওলার অর্ডার যে।

তারা কারা ? তোমাদের ওপরওলা ?

তারাও তোমাদের মতো মানুষ। তবে অন্য গ্রহের, পৃথিবীর মানুষ নয়।

তবে কোথাকার ?

আমরা সবুজ গ্রহ থেকে আসছি। তোমাদের মোবাইল, কম্পিউটার, ল্যাপটপগুলো প্রথমে কব্জা করে ফেলব। তারপর তোমাদের মনগুলো। ওখানে একবার ভাইরাসে ছেয়ে গেলে তোমরা আর ভালো থাকতে পারবে না। নিজেদের মধ্যে লাঠা-লাঠি, খুনো-খুনি করে মরবে। একবার যদি তোমার আত্মাকে মোবাইলে বা ল্যাপটপে বন্দী করে ফেলি, তুমি সারা জীবন ওর মধ্যেই আটকে থাকবে। আর তোমার শরীরের ভেতর ঢুকে পড়ব আমরা অর্থাৎ ভাইরাসরা। যা ইচ্ছা করব তখন।

তাহলে তো পৃথিবীর খুব বিপদ। তোমার কথাগুলো শুনে খুব খারাপ লাগল। তোমরা এরকম করছ কেন ?

তোমরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে মরে গেলে সবুজ গ্রহের বাসিন্দাদের লাভ। ওরা এখানে এসে নতুন বসতি গড়বে। এখন ওখানে লোক সংখ্যা খুব বেড়ে গেছে। তাই বিভিন্ন গ্রহে ওরা ছড়িয়ে পড়ছে খুব তাড়াতাড়ি। আমাদের দখল নিতে পাঠাচ্ছে। আমাদের ল্যাবে বানানো হয়েছে। এই যে আজ মানুষের মনে এত হিংসা, একে অপরকে সহ্য করতে পারে না, এর কারণ কী জান? বিভিন্ন দেশে যে এত রকম প্রাণঘাতী ব্লাস্ট হচ্ছে এসব কারা করছে ? যাদের মধ্যে দয়া-মায়া, স্নেহ-ভালবাসা কিছু নেই তাদের মধ্যে ভাইরাস দ্রুত গতিতে বাসা বাঁধে। তাদের আত্মাকে সহজেই বন্দী করা যায় মোবাইলে অথবা ল্যাপিতে।

এতসব গোপন কথা আমাকে বলছ যে তোমার বস রাগ করবে না ?

তা একটু করবে বই কি। আমাদের বেশি কথা বলা নিষেধ। কথা কম কাজ বেশি। কিন্তু তোমাকে দেখছি সাত দিন ধরে একটা গল্প লেখার চেষ্টা করছ। কাগজ কলম নষ্ট করছ কিন্তু একদমই কাজ এগুচ্ছে না। তাই ভাবলাম তোমাকে একটু সাহায্য করা যাক। গল্প কবিতা লেখার হাত তোমার একদমই ভালো নয়, তবে চেষ্টা আছে সেটা বেশ ভালো। আমার সাথে থাকতে থাকতে তুমি সব শিখে যাবে। আমাদের গ্রহে কেউ গল্প কবিতা লেখে না, কেউ ছবি আঁকে না।

কী আর শিখব তোমার কাছে ? তুমি তো আমার আত্মাটাকে ফোনের ভেতর বন্দী করে ফেলবে!

চেষ্টা করছি তবে পারছি না, মায়া পড়ে গেছে এক সাথে থাকতে থাকতে।

কেন ? মায়া পড়ে যাচ্ছে কেন ?

আসলে আমাদের অন্য ভাইরাসরা যেখানে যেখানে গেছে সব জায়গাতেই খুব চটপটে করিৎকর্মা লোক পেয়েছে। তুমি এদের থেকে একদমই ব্যতিক্রম। চটপটে আর মেধাবী লোক দেখে দেখে বিরক্তি ধরে গেছে। আমার ভাইরাস বন্ধুদের সাথে মাঝে মাঝে কথা বার্তা হয় এই নিয়ে। এই তুমি এত দিন ধরে এই রকম একটা মোবাইল নিয়ে রেখে দিয়েছ যত্ন করে। অন্য লোক হলে ও.এল.এক্স.-এ বেচে দিয়ে নতুন একটা কিনে নিত। কিন্তু তুমি এত অলস যে সেটা করছ না। করিৎকর্মা ছেলে মেয়ে হলে কবেই করে ফেলত।

তোমার প্রশংসাগুলো সত্যি খুব সুন্দর। কিন্ত হজম করতে কষ্ট হচ্ছে। গল্প লিখতে সাহায্য করার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আমি নিশ্চয় লিখব।

আরে তুমি দেখছি রাগ করে ফেলছ। আমি তো ভালো কথাই বলছিলাম।

শুরু থেকে তুমি অনেক ভালো ভালো কথাই বলে যাচ্ছ। পৃথিবীর লোকদের বাঁচার কি কোনও উপায় নেই ? সবুজ গ্রহ মানে নেপচুনের বাসিন্দাদের থেকে ?

না নেই। একটাই উপায় আছে আর সেটা তোমরা কখনওই পারবে না।

কী বল না শুনি ?

শুনেও কোনও লাভ হবে না। তবে বলছি।

ভাইরাস যে উপায়টা বলে গেল চুপি চুপি সেটা শক্ত ঠিকই তবে অসম্ভবও নয়। কী খুব কৌতূহল হচ্ছে তো জানার জন্য? বলছি, দেখো চেষ্টা করে পারো কি না। না পারলে আমাদের আত্মাগুলো সব মোবাইলের ভেতর বন্দী হয়ে যাবে।

তোমরা যদি প্রাণ খুলে হাসতে থাকো আর মনের আনন্দে থাকো, একে অপরকে ভালবাসতে পারো তাহলে আমরা ভাইরাসেরা তোমাদের মনের মধ্যে ঢুকতেই পারব না, বাস করা তো দূরের কথা। আর তোমাদের আত্মাকেও বন্দী করা যাবে না। খুব শক্ত কাজ বল!

ভাইরাসের সাথে মাঝে মাঝে এখনও কথা হয়। সবুজ গ্রহ থেকে দল খানেক সবুজ মানুষ এসে পড়ল বলে! পৃথিবীটার বারোটা বাজাতে। তবে যতদিন না ওরা সমস্ত মানুষের আত্মাকে মোবাইল অথবা ল্যাপটপের ভেতর বন্দী করতে পারছে ততদিন ওদের পরিকল্পনা সফল হবে না। তাই আমার কোনও ভয় নেই, আর তোমাদের ? যতদিন এখানে ভালবাসা আছে, গল্প আছে, কবিতা আছে, ততদিন ওরা পুরোপুরি সফল হবে না। ♦♦♦

চিত্রগ্রাহক - সৌম্যদীপ পাল

গান দরিয়া

নতুন বছরে দেখো নতুন সূর্যোদয়

মানিকের মগজাস্ত্র

অগ্নিভ চক্রবর্তী

"বছরটা ফেলুদা ৫০এর। তাই ফেলুদার পাশাপাশি তাঁর স্রষ্টাকেও একই সঙ্গে সম্মান জানিয়ে এই রচনা। ৩৫টি সমাপ্ত কাহিনির সমাবেশে রচিত একটি প্রবন্ধ।"

ফেলুদা যেবার প্রথম কৈলাসে গেল গোয়েন্দাগিরি করতে, সেবার সে এক রকম ভয়ানক কেলেঙ্কারি করে বসল। সে পেয়ে গেল একটি গোলাপী রঙের মুক্তা, শকুন্তলার একটি সুন্দর কণ্ঠহার, কৈলাস চৌধুরীর একটি দামী পাথর এবং মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের অপূর্ব এক বাদশাহী আংটিও ! যখন সে জানল যে ভূস্বর্গ ভয়ঙ্কর আর গোরস্থানে সাবধানে থাকা দরকার, তখন বোম্বাইয়ের বোম্বেটেরা সব হানা দিয়েছে এবং একই সঙ্গে তখন গ্যাংটকে ঘটল গণ্ডগোল। যখন এবার অপ্সরা থিয়েটার নিয়ে মামলা উঠল, তখন ফেলুদা লন্ডনে। ফেলুদা কিন্তু এরপর গোলকধামে বসে রয়েল বেঙ্গল রহস্যের সমাধানও করেছেন। যখন ফেলুদা সমাদ্দারের চাবি সাথে নিয়ে ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা সমাধানে ব্যস্ত, তখন হঠাৎ মুকুল বলে উঠল, "সোনার কেল্লা"। অপ্রত্যাশিত ভাবে জটায়ু বললেন, "তবে কি এবার কাণ্ড কেদারনাথে ?" তখন আবার ফেলুদা তাঁর যত কাণ্ড কাঠমান্ডুতে নিয়ে লেখা ডাঃ মুন্সির ডায়রিটা পড়তে গিয়ে পেয়ে বসল ছিন্নমস্তার অভিশাপ এবং টিনটরেটোর যীশুর একটি সুন্দর পোট্রেট ! ফেলুদা যখন অম্বর সেন অন্তর্ধান –এর ব্যপারে তদন্ত করতে লাগল, সে তখন পেল বেশ কিছু দুস্প্রাপ্য জিনিস ! তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য- বারোটি জাহাঙ্গীরের আমলের স্বর্ণমুদ্রা, একটি নেপোলিয়নের চিঠি, রবার্টসনের রুবি এবং একটা বাক্স যা ঘিরে প্রায় ইন্দ্রজালের মত রহস্য ঘনিয়ে উঠল। তখন আবার আমাদের বোসপুকুরে বেশ বড় রকমের খুনখারাপি হল। সেদিন থেকেই জায়গাটা হত্যাপুরী নামেই খ্যাত। তবে ৩টি গল্প অসমাপ্ত থাকলেও দার্জিলিং আজও জমজমাট। তাই শেষে বলতে হয় "জয় বাবা ফেলুনাথ" !

সুপারনোভা

চিরন্তন ভট্টাচার্য্য

ঘুম থেকে ওঠার কিছুক্ষণ পরেই সকালটা ঘেঁটে গেল অর্কপ্রভ-র। অথচ এমনটা হওয়ার কথা একেবারেই ছিল না। আজ সকালে কোনো টিউশন নেই। বুধবার দিন সকালটা ফাঁকাই থাকে। আগে থেকেই ঠিক করে নিয়েছিল অনেকক্ষণ ধরে ঘুমোবে। বেলা করে ঘুম থেকে ওঠার মস্ত সুবিধা হল সকালবেলার খাওয়ার ব্যাপারটা অনায়াসে স্কিপ করা যায়। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একটা খুব সুন্দর স্বপ্নও দেখছিল অর্ক – ঠাণ্ডা একটা ঘরে খুব বড় একটা চেয়ারে ভীষণ রিলাক্সড় বসে আছে ও, আর চোখের সামনে একটা জায়ান্ট এল সি ডি স্ক্রিনে পৃথিবীর বেশ কয়েকটা শহরের নাম ফুটে উঠছে: টরেন্টো, কিয়াটো, সাও পাওলো, প্রিটোরিয়া, আটলান্টা সিটি, কলকাতা... ছবিগুলো পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে আর সবুজ একটা গ্রাফিক্স ইনডেক্স শুধু উপরের দিকে উঠেই চলেছে, উঠেই চলেছে। ভোরবেলার স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়। অবশ্য টেকনিক্যালি সকাল সাড়ে আটটাকে ভোর বলা যায় কি না - সেটা একটা প্রশ্নচিহ্ন !

ঘুমটা ভাঙল সিগারেট পোড়ার গন্ধে। চোখ না খুলেই অর্ক বুঝতে পারছিল অম্লান এসেছে। অভ্যাসবশত চোখ না খুলেই দুই আঙুল ফাঁক করে হাতটা অম্লানের দিকে বাড়িয়ে দিল অর্ক। এবং জ্বলন্ত সিগারেটটাও বশীভূত ভৃত্যের মতো আঙুলের ফাঁকে চলে এলো। অম্লান এখন নেভি কাট ছাড়া খায় না। একটা টান মেরে চোখ খুলে অর্ক দেখল সক্কালবেলাতেই বেশ ফিটফাট হয়ে অম্লান বসে আছে। অম্লানের অবশ্য ফিটফাট থাকাটাই স্বাভাবিক। ও এখন বেশ উচ্চ শ্রেণীর চাকুরে। মাস কয়েক হল বি সি এস দিয়ে

ভালো একটা পোস্ট বাগিয়েছে। আপাতত কলকাতায় থাকতে পারছে। ট্রেনি পিরিয়ড চলছে। অম্লান আসাটাও খারাপ কিছু না। অম্লান কাছেই অন্য একটা মেসে এখনো আছে তাই অফিস যাওয়ার সময় ব্রিজের তলায় রামলক্ষণের দোকান থেকে বাটার টোস্ট, কলা আর ডিমের পোচ দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে অফিস যায়। লাঞ্চটা অফিসের ক্যান্টিনেই সারে। অম্লানের সঙ্গে বেরোলে ওর-ও ব্রেকফাস্টটা অম্লানের পয়সাতেই হয়ে যাবে। মুখেচোখে জল দিয়ে অম্লানের সাথে বেরোল অর্ক। টোস্টে একটা কামড় দিয়ে অম্লান একটু অন্যমনস্ক হয়েই বলল, 'আজকে কত তারিখ তোর খেয়াল আছে ?' সক্কালবেলায় এইসব উদ্ভট প্রশ্ন করার মানেটা বোঝার আগেই আজকের তারিখটা মনে পড়ে গেল অর্ক-র। আজ উনিশে ফেব্রুয়ারি, মানে আজ রুমকি-র জন্মদিন। এর পরবর্তী যে ঘটনাটা ঘটার ছিল তা হল অর্ক অম্লানের দিকে তাকিয়ে বলবে, 'এক্কেবারে খালি হাতে তো যাওয়া যায় না বস, তুই তাহলে আমাকে আজকের জন্যে শ'খানেক টাকা ধার দে! না হলে মাইরি প্রেস্টিজ থাকবে না !' এবং এই পর্যন্ত ঘটনাটা এইভাবেই ঘটলোও। এর পরবর্তী যে ঘটনাটা ঘটার ছিল সেটা হলো অম্লান অম্লানবদনে পকেট থেকে মানিপার্স বার করে একশো টাকার নোট অর্ক-র দিকে বাড়িয়ে দেবে আর একটা ছোট্ট নোটবুক খুলে আজকের তারিখ লিখে সময় লিখবে মিনিট শুদ্ধ, তারপরে অ্যামাউন্ট লিখবে –4164 + 100 = 4264 টাকা। সময়টা লিখে রাখার ব্যাপারে অম্লানের একটা যুক্তি আছে যে এই আধুনিক যুগে ইন্টারেস্টের হিসাবটা শুধু দিনে নয়, ঘণ্টা মিনিট সহযোগে করা উচিৎ। সেকেন্ডের হিসেবটাও যে কেন লেখে না কে যানে? অর্ক যানে সুদের হিসেব অম্লান অনায়াসে করে ফেলবে! অম্লান অঙ্কে ভীষণ পটু ! কিন্তু আজকে ঘটনাটা ঠিক এইভাবে ঘটলো না। অম্লান জানিয়ে দিলো, 'নাঃ এখন মাসের শেষ। ধার দেওয়ার মতো টাকা নেই !'

'মাসের শেষ মানে ? আজ তো সবে উনিশ তারিখ ? এর মধ্যেই মাস শেষ !'

'মাসের শেষ দশটা দিন মাসের শেষ বলেই তো চলে, এটা তো ফেব্রুয়ারি মাস ! তাই মাসের শেষ !'

'তুই কি আজকাল জুয়া ফুয়া খেলছিস না কি ? এতগুলো টাকা বেতন পাস ! এরমধ্যেই সব শেষ !'

'নাঃ বিয়ে করতে হবে, তাই ফ্ল্যাট কিনতে হবে আর বৌ-এর গয়না কিনতে হবে। তাই টাকা জমাচ্ছি !'

এতো দুঃখের মাঝেও হাসি পেলো অর্কর। অম্লান গয়না কিনবে রুমকির জন্যে ? রুমকি তো হাতে একটা চুড়িও পরে না। শুধু দুটো কানের দুল আছে, তাও এতো ম্যাড়ম্যাড়ে যে ভালো করে চোখেও পড়ে না। তার জন্য অম্লান গয়না কিনবে আর সেই জন্য বন্ধুর একটা জেনুইন দরকারে মাত্র একশো-টা টাকা দিতে পারবে না !

রুমকি বললেই যে ছবিটা চোখের সামনে ফুটে ওঠে তা হল, ঘাড় অবধি নেমে আসা আঙুর থোকার মতো অবিন্যস্ত চুল, এলোমেলো... প্রসাধন-এর চর্চা প্রায় নেই বললেই চলে; দেখতে অপরূপা সুন্দরীও না আবার ফেলে দেওয়ার মতোও নয়। তবে রুমকি-র নিজের কোনো সৌন্দর্য সচেতনতা আছে কি না সন্দেহের বিষয় ! সাজগোজের বালায় নেই, একটা জিনস আর টি-সার্ট আর পায়ে একটা স্নিকার্স লাগিয়ে সারা মুল্লুক ঘুরে বেড়ায়।

রুমকির সাথে অর্ক-র পরিচয় রুমকির ভাই বিল্টু-কে ইতিহাস পড়াতে গিয়ে। অম্লান আগে থেকেই বিল্টু-কে অঙ্ক আর সায়েন্স পড়াত। সেই সময়ে অর্ক-র হাতে একটাও টিউশন ছিল না। আবার বিল্টুর সব সাবজেক্টের টিচার পাওয়া গেলেও ইতিহাসের টিচার পাওয়া যায়নি। সুযোগ বুঝে অম্লান ইকনোমিকস নিয়ে পাস অর্ক-কে 'হিস্ট্রি অনার্স' বলে চালিয়ে ওই টিউশনটা যোগাড় করে দিয়েছিল। রুমকি তখন যাদবপুরে কম্পারেটিভে পি.জি. করছে। কিছুদিন আলাপের পরেই বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। এক্কেবারে তুই তোকারির সম্পর্ক হয়ে যায়। রুমকিও এখন স্কুল সার্ভিস পাস করে নুঙ্গি-র ওদিকে কোন একটা হাইস্কুলে মাস্টারি করছে। অর্ক-র এখন কাছের বন্ধু বলতে এই দুজন– অম্লান আর রুমকি। যদিও অর্ক মনে করে রুমকি ওর ওপরে অনাবশ্যক রুড। রুমকি-র কাছে টাকা ধার করা যায় না। চাইতে গেলে বাক্যের চোটে ভূত ভাগিয়ে দেবে ! তবে না চাইতেই দেয়, এমনকি না জানিয়েই দেয় ! অনেকদিন এমন হয়েছে যে মেসের রুমে ঢুকে জামা খুলতে গিয়ে দেখেছে সম্পূর্ণ ফাঁকা ছিল যে পকেটটা সেটাতে একটা একশো টাকার কড়কড়ে নোট। রুমকিকে জিজ্ঞেস করে কোনো লাভ নেই, উল্টে অর্ককেই হয়তো কেস খাইয়ে দেবে, 'তুই কোত্থেকে পকেটমারি করে না কি করে টাকা পেয়েছিস ! আমি তার কি জানি?' একটা জিনিষই আশ্চর্য যে পকেট

ফাঁকা থাকলেই রুমকি কি করে টের পায়! আবার টের যদি বা পায়, গত দু'দিন ধরে টের পেলো না কেন !

অর্ককে এখন প্রতিদিন সন্ধেবেলার পর রুমকিদের বাড়িতে হাজিরা দিতে হচ্ছে। রুমকি নাকি কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দেবে তাই ওর তৈরি করা পড়া গুলো ধরতে হবে। রুমকি স্কুল থেকে ফিরে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা নাগাদ টিফিন সারে, ওকেও সেই সময়েই হাজিরা দিতে হয়। রুমকি এইসব ব্যাপারে খুব কড়া। ঠিক সময়ে হাজিরা না দিলে তখনকার মতো কিছু বলবে না কিন্তু পরের দিন সাত সক্কালে ওর মেসের ঘরের দরজায় এসে সেই ভুলের জন্য গাল পেড়ে যাবে। সকালবেলার ঘুমের দফারফা। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে অর্ক বুঝতে পারছে, রুমকি নিজে যত না পড়ছে তার থেকে বেশী পড়তে হচ্ছে অর্ক-কেই! আর সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হোল অর্ক-কেই রুমকি-র কাছে পড়া দিতে হচ্ছে ! কিন্তু কিছু করার নেই, জোর যার মুল্লুক তার ! আশঙ্কায় আছে এরপর কোনদিন হয়তো রুমকি ফর্ম কিনে এনে বলবে, 'ফর্মটা ফিল আপ করে কাল দিয়ে যাস !' তবে যেদিন অম্লান আসে সেদিন রুমকির মুখের ভাবটাই পালটে যায়। খুব খুশী খুশী ভাবে নিজের হাতে চা আর ডিমের অমলেট করে আনে আর খুব হেসে হেসে গল্প করে। সেইজন্য অর্ক-র মনে হয় ওদের মধ্যে একটা স্পেশাল সম্পর্ক আছে। ওরা অবশ্য এই ব্যাপারে এখনও কোনো অফিসিয়াল অ্যানাউন্সমেন্ট করেনি। তবে বোঝা যায় ! এমনকি এটাও খেয়াল করেছে যে রুমকির মা-ও অম্লান-কে খুব পছন্দ করেন। অম্লান এলেই বেশ হাসি হাসি মুখ করে কথা বলেন। অর্ক-র বেলায় তো তা হয় না। সবাই যেন কেমন গম্ভীর থাকে। রুমকির সাথে অম্লান কে ভালোই মানাবে মনে হয়, যাকে বলে এক্কেবারে রাজযোটক মিল !

রোজগারের ব্যাপারে অর্ক-র একটা নিজস্ব চিন্তা আছে। অম্লান কিম্বা রুমকি-র মতো চাকরিবাকরি করার জন্য ওর জন্ম হয়নি বলেই ওর ধারনা। অর্ক একটা ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মালিক হতে চায়। ও একজন 'গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার' হতে চায়। সাধারণ জামা-কাপড় না ! মানুষ যে সব সবজি ইত্যাদির খোসা গুলো ফেলে দেয় সেইগুলো থেকে তন্তু সংগ্রহ করে তার থেকে জামা-কাপড় তৈরি হবে। মানুষের মধ্যে এখন ভেজিটেবলস্-এর খুব ডিমান্ড। অনেকদিন আগে ছোটবেলায় বিমল করের একটা লেখা পড়েছিল 'গণপতি ভেজিটেবল স্যু কোম্পানি', সেটা থেকেই আইডিয়াটা মাথায় আসে আর তারপর ওর কেমিস্ট্রি-র বন্ধু দিব্যজ্যোতি-র সাথে আলোচনায় জানতে পেরেছে এমন কিছু হওয়াটা খুব আশ্চর্যের কিছু না। ওর এই ইচ্ছাটার কথা অম্লান-কেও বলেছে কিন্তু অম্লান খুব একটা গুরুত্ব দেয়নি। অম্লান নিজেকে প্র্যাকটিকাল বলে মনে করে। আসলে নিরাশাবাদি ! এমনটাই ধারনা অর্ক-র। বুকের মধ্যে অসম্ভবকে ছুঁতে পারার স্বপ্নই যদি না জন্মাল তাহলে মানুষ হয়ে জন্ম নিয়েই কি লাভ ! তবে রুমকি-কে সাহস করে কথাটা এখনো বলতে পারেনি। কিন্তু ওর মনে হচ্ছে অম্লান নিশ্চয়ই লাগিয়েছে ! কারণ বেশ কিছুদিন হোল অর্ক-র ওপর রুমকি-র রুডনেশটা আরও বেড়েছে। অবশ্য প্রত্যেকটা মানুষেরই নিজের নিজের মতো করে ভাবার স্বাধীনতা আছে। তবে ওর স্বপ্নটা পূরণ হয়ে গেলে একদিন ও এদের সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে। এখন রোজগার বলতে অবশ্য সকাল বিকাল তিনটে টিউশন করে হাজার পাঁচেক টাকা। তাতে মেসে খাওয়া থাকার খরচাটা কোনোরকমে চলে যায়। এর বাইরে অম্লানের থেকে ধার আর রুমকির না জানিয়ে দেওয়া টাকা। কিন্তু আজ বেশ সমস্যাতেই পড়েছে অর্ক। সব মিলিয়ে নিজের কাছে মাত্র ত্রিশটা টাকা আছে। গত দু'দিন ফাঁকা পকেট ফাঁকাই রয়ে গেছে। আশীর্বাদের মতো কোনো একশো টাকার নোট তাতে এসে পড়েনি ! তার ওপর আজকে অম্লান-টাও বিশ্বাসঘাতকতা করল ! সব মিলিয়ে আজ অবস্থা খুব সঙ্গিন অর্ক-র !

রুমকি ওর জন্মদিনে খুব বেশী কাউকে নিমন্ত্রণ করে না। অর্ক আর অম্লান ছাড়া আর দু-তিনজন ওর স্কুল কলেজ জীবনের বন্ধু আছে তারা আসে। প্রতিবেশী কিছু বাচ্চাও আসে। তবে ওরা আগেই খেয়েদেয়ে চলে যায়। তাই কিছু না নিয়ে ঢুকলেও কিছু না। ওদের সবাইকেই অর্ক চেনে কিন্তু কোথাও যেন একটা দ্বিধা থেকেই যায়! যেখান থেকে অর্ক আন্দাজ করতে পারে এত বছর নির্বাসনে থাকার পরও ওর মধ্যেকার সামাজিক বোধটা এখনও পুরোটা হারায়নি ! সমস্ত দিক ভেবেও কোনও উপায় খুঁজে পায় না অর্ক।

বেশী ভাবলে মাথার স্নায়ুগুলো জট পাকিয়ে যেতে পারে এই ভেবে বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু বেরিয়ে পড়লেই তো আর টাকাপয়সা হাওয়া-বাতাসের মতো পকেটে এসে ঢুকে যাবে না ! অন্য কিছু উপায় ভাবতে হবে। একবার ভাবল যে ওর ছাত্রী স্বর্ণ-দের বাড়িতে গেলে পারে। স্বর্ণ-র মা আনন্দী কাকিমা ওর প্রতি একটা বাৎসল্য স্নেহ পোষণ করেন।

অ্যাডভানস হিসেবে কিছুটা টাকা চাইতেই পারা যায়। কিন্তু পা এগোল না। রেপুটেশন খারাপ করে লাভ নেই। এখন এই ক'টি টিউশন-ই ওর সম্বল। এখন টাকা চাইতে গেলে খারাপ কিছু সন্দেহ করতে পারে। অন্য দু'টো টিউশন মাত্র মাস দুয়েক হল ঢুকেছে। এখন টাকা চাইতে যাবার মতো সম্পর্কই তৈরি হয়নি। নিজেকে খুব অসহায় মনে করছিল অর্ক। আফসোস হচ্ছিল যে এই সময় যদি পকেটমারি করার বিদ্যাটা জানা থাকতো অল্প সময়েই শ'দুয়েক টাকা চলে আসতো। কিন্তু জানা যখন নেই তখন আর ও নিয়ে ভেবেও লাভ নেই ! একবার ভাবল যে সময় কাটাতে আর মাথার ভার একটু লাঘব করতে কফি হাউসে গিয়ে একটু বসবে। কিন্তু তাতেও সমস্যা কোনো কবি-র সঙ্গে দেখা হলে আবার তার সদ্য প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কিনতে বলতে পারে। সেক্ষেত্রে ওই তিরিশটা টাকাও হাওয়া হয়ে যাবে। কেন না ও হিসাব করে দেখেছে। কাব্যগ্রন্থের গড়পড়তা মূল্য ওই ডিসকাউন্ট ইত্যাদি বাদ দিয়ে তিরিশ টাকাই হয় প্রত্যেকবার ! ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত! ধুপ বিক্রি, খবরের কাগজ বিক্রি থেকে শুরু করে সাধু বাবা হয়ে বসে পড়া পর্যন্ত টাকা রোজগারের অনেকগুলো উপায় ওর মাথায় এলেও কার্যকারী কোনো উপায় মাথায় আসছিল না। ওদিকে সূর্য পশ্চিমে ঢলতে শুরু করেছে। মেসে ফিরে স্নান খাওয়া সেরে একটু ঘুম দিলো। আজ বিকেলের টিউশনটা কামাই হবেই বুঝতেই পারলো অর্ক। এই মানসিক অবস্থা নিয়ে পড়ানো যায় না। পরে একদিন মেক-আপ করে দিলেই হবে। ঘুমতো হলই না। মাথায় কোনো উপায়ও এলো না। সন্ধ্যের দিকে আবার একবার বেরোল অর্ক। যদি তেমন কোনো বন্ধুকে পাওয়া যায় যে ধার দিতে পারে খুব উদারভাবে !

জগন্নাথের চায়ের দোকানে খুব উদাস ভাবে বসে আছে সুরূপা দি। সুরূপা দি আই আই সি বি তে রিসার্চ করে। অর্ক-কে দেখতে পেয়েই সুরূপা দি হাসল, 'একটা কাজ করে দিবি ভাই ? সামনে পল্টুর দোকানটা থেকে দু'প্যাকেট গোল্ড ফ্লেক এনে দিবি একটু ?' এনে দেওয়াটা কোনো সমস্যাই না। বরঞ্চ এনে দিলে এককাপ চা আর একটা লম্বা গোল্ড ফ্লেক বিনা পয়সাতে খাওয়াও হয়ে যায়। সুরূপা দির সমস্যা হোল সারাদিনে এন্তার সিগারেট খায় কিন্তু সহজে নিজে কিনতে যেতে চায় না। অবশ্য এজন্য সুরূপা দিকে দোষ দেওয়া যায় না। কোনো নেশার দ্রব্যই ভালো কিছু নয় এটা ঠিক কিন্তু নেশার দ্রব্যের যে লিঙ্গ বিভাজন নেই তা এই সমাজের 'সৎচরিত্র' জনগণকে বোঝায় কে! একটা মেয়ে দোকানে দাঁড়িয়ে সিগারেট কিনছে এটা দেখতেও ভালো সংখ্যাতেই দর্শক জুটে যায় এখনো ! সুরূপা দি-র অবশ্য ভাইয়ের অভাব নেই। সুন্দর ব্যাবহারের জন্য সবাই ভালোবাসে মানুষটিকে। সুরূপা দি-র কোনো না কোনো ভাই কিনে এনে দিয়ে যায়। সুরূপা দি-র কাছে টাকা চাওয়াই যায়। কিন্তু সমস্যা আছে দু'টো। প্রথমত: শোধ করা যাবেই না। দ্বিতীয়ত: সুরূপা দি-র কাছে একশো টাকা চাইলে দু'শো দেবে, সাথে সাবধান বানী, 'সস্তার মদ খাস না ভাই, আর একদম বেশী খাবি না !' টাকাটা যে ও একটা মহৎ উপলক্ষে নিচ্ছে তা বোঝানোই দুষ্কর ! অম্লানের সাথে ন'মাসে ছ'মাসে এক-আধবার হার্ড ড্রিঙ্কস নিয়ে বসে ঠিক কথাই তাই বলে এতো নেশা নেই যে তার জন্য কারো কাছে হাত পাততে হবে !

ঘোরাঘুরিতে কেটে যাচ্ছিল সময়। রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠেছে কখন। সন্ধ্যা নেমে আসার একটা নিজস্ব গন্ধ আছে। অভ্যাসগত প্রবৃত্তি তাকে মনে করাচ্ছিল এখন রুমকিদের বাড়িতে যেতে হবে রুমকির পড়া ধরতে হবে অথবা রুমকির কাছে পড়া দিতে হবে। তার পরেই মনে পড়লো আজ তো উৎসব। অম্লান হয়তো এতক্ষণে পৌঁছে গেছে। এসে পড়েছে বাকি অতিথিরাও। কেক কেটে সেলিব্রেশান সুরু হবে এখুনি। প্রতিবছরই এই সময়টায় উপস্থিত থাকে অর্ক। গোল হয়ে থাকা অতিথিদের মাঝখানে সেও থাকে একজন আনন্দের অংশীদার হয়ে। রুমকির প্রত্যেকটা জন্মদিনে কবিতার বই উপহার দেওয়া অর্ক-র অভ্যাস হয়ে গেছে। ভালো লাগে। এই বছর পারলো না। এখন আর যেতে ইচ্ছে করছে না ওর। যাবে। একটু পরেই না হয় যাবে। ততক্ষণে উৎসব কেটে যাবে। সব অনুপস্থিতি সবসময় কাউন্ট হয় না। এই সময় অর্ক না থাকলেও কেউ অতটা খেয়াল করবে না। ও জানে। ঠিক ডিনার টাইমে গিয়ে উপস্থিত হলেই হবে। না হলে অবশ্য অভদ্রতা হবে। রুমকি কোনোদিন অম্লান বা অর্ককে নিমন্ত্রণ করে না ওর জন্মদিনে। কেন না ও জানে ওরা যাবেই। একদম ডিনার শেষে ফিরে আসে।

ঝিলের ধারে ঝিরঝির করে হাওয়া দিচ্ছিল। মরা শীতের হাওয়া। পাড়ের দিকে একটা বেঞ্চ ধরে বসে পড়ল অর্ক। আজ আর কারো কাছে যাওয়ার নেই এখন। অনেকদিন আগে একটু আধটু কবিতা লিখত অর্ক। এখন অনেকদিন

হয়ে গেল কবিতার লাইনগুলো আর ধরা দিতে চায় না। স্বপ্ন আর জিজ্ঞাসার মাঝে থমকে যাওয়া একটা সময়ের হয়তো এটাই রেওয়াজ। ঝিম ধরিয়ে দেওয়া প্রকৃতিকে মাঝে মাঝে চিরে দিচ্ছিল ট্রেনের আওয়াজ। রেল-পুলের নীচের বস্তির থেকে ভেসে আসছিল কদর্য ঝগড়ার আওয়াজ। চলমান জীবনের ছবি। গাছের তলায় জমে আছে অন্ধকার। সেখান থেকেই সোনালী ডানার মতো ঝিলিক দিচ্ছিল, মাঝে মাঝে, ব্রেসলেট পরা ফর্সা রোগা একটা মেয়েলি হাত। মাঝে মাঝে ঝিকিয়ে উঠছিল একটা আগুনের আভা আবার নিভে যাচ্ছিল। খুব নিচু স্বরে নারী-পুরুষের মিলিত বাক্যালাপ ভেসে আসছিল। সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। সময় গড়িয়ে কোন দিকে যায় ? সময়ের কি কোনো ডেসটিনেশন পয়েন্ট আছে? আছে কি কোনো মোহানা ?

হাতের ঘড়িতে সময়টা দেখে চমকে উঠল অর্ক। ঝাপসা হয়ে যাওয়া কাঁচের মধ্যেই ফুটে উঠেছে রাত্রি দশটা বেজে পেরিয়ে যাওয়ার খবর। উঠে পড়ল। রাস্তার একটা দোকান থেকে একটা ডার্ক চকোলেটের ছোট স্ট্রিপ কিনল। ত্রিশটা টাকায় এর থেকে বেশী কি আর হয় ! রুমকি ডার্ক চকোলেট খুব ভালোবাসে। রুমকিদের ফ্ল্যাটের গলিটায় ঢোকার আগের বাড়িটায় আজও দেখল –স্লিভলেস একটা নাইটি জাতীয় কিছু পরে ব্যালকনির গ্রিল-এ হাত রেখে 'মনীষা কৈরালা' দাঁড়িয়ে আছে! আসলে মেয়েটার নাম জানে না অর্ক। মেয়েটাকে দেখতে যেন ঠিক ফিল্মস্টার মনীষা কৈরালা ! মেয়েটাকে দেখলেই অর্ক-র চলার গতি রুদ্ধ হয়ে যায়। ওর এই দুর্বলতার কথা ওর পরিচিতরাও জেনে গেছে এখন ! অবশ্য মেয়েটার নামে প্রচলিত অর্থে সুনাম যে কিছু নেই সেটাও অর্ক জানে। সেদিন কথায় কথায় মেসের নির্মল বলছিল, 'অর্ক'দা সেদিন তোমার মনীষা কৈরালা কে দেখলাম। একা একা মেরি স্টোপ্স ক্লিনিকে ঢুকছিল !' অর্ক অবশ্য উত্তর দিয়েছিল, 'মেরি স্টোপ্স একটা ডক্টরস ক্লিনিক, কোনও এন্টারটেইনমেন্ট এর জায়গা তো নয় যে তা নিয়ে রসালো গল্প তৈরি হতে পারে ! মানুষ বিভিন্ন দরকারে ওখানে যায়। আর তুমি যা ইঙ্গিত করতে চাইছ সেই দরকারেও যদি গিয়ে থাকে তাহলেও সে খুব কষ্টের খবর ভাই। বিসর্জনের বাজনা একা একা শোনা সত্যিই খুব কষ্টের। বিশ্বাস করো শুধু বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে অনেক দিক থেকে কম্প্রোমাইজ করতে হয়। সেও একটা জীবন সংগ্রাম।' আজও চলার গতিটা কমে আসছিল। মেয়েটাও যেন তাকিয়ে আছে ওর দিকে। মেয়েটাও কি কিছু বলতে চায় ! হয়তো নয়। আবার হয়তো কিছু। এইসব না বলা কথাগুলো আর কোনদিনই বলা হয়ে উঠবে না। শুধু একটা সময়ের কাছে থমকে থাকবে একটা অপেক্ষা, একটা কৌতূহল, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়া।

কিন্তু অন্য একটা বোধ, একটা তাড়না, তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ওকে। অর্ক জানে আজ রুমকিদের বাড়িতে যেতে ওকে হবেই। মাথার কোনো এক অজানা কোনায় কিছু একটা অনুপস্থিতি টের পাচ্ছিল অর্ক। টের পাচ্ছিল একটা কম্পন আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে।

রুমকিদের ফ্ল্যাটের দরজায় দাঁড়িয়েও কলিং বেলের সুইচটায় হাত দিতে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে অর্ক। রাত অনেকটা হয়ে গেছে। যদি রুমকিদের ডিনার করা সারা হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে অপ্রস্তুতে পড়বে সবাই। মেঝের দিকে তাকিয়ে দেখল, অম্লানের জুতোজোড়া রয়েছে দরজার বাইরে। সেই সাহসেই সুইচ'টা টিপল। দরজাটা রুমকির মা খুললেন। অর্ক একটু হাসার চেষ্টা করল। নিমন্ত্রণ খেতে আসা অতিথিদেরকে অভ্যর্থনা করাটাই রেওয়াজ। অত কিছু যে ঘটবে না, তা ভালভাবেই জানে অর্ক। ওর শুধু এইটুকু মনে হয়েছিল যে 'আজও কি রুমকির মা সেই রকম গোমড়া মুখেই দরজা খুলবেন?' গোমড়া মুখে দরজা খোলেন নি একথা ঠিক। কিন্তু ওনার মুখের মধ্যে একটা উদ্বেগের ছায়া চোখ এড়ালো না। বাকি সবই তো ঠিকঠাক আছে। সোফায় বসে টিভিতে খবর দেখছেন রুমকির বাবা। অন্যদিন দেখা হলেই হাসেন, মাঝেমাঝে কবিতা-গল্প নিয়ে আলোচনাও হয়। আজ কিন্তু হাসলেন না। ওনার মুখেও যেন হালকা একটা চিন্তার ছায়া কাজ করছিল। অবশ্য খবর টবর দেখার সময় মানুষের এমন ভাব হয় !

অভ্যাসমতো রুমকির ঘরটাতেই ঢুকল অর্ক। দেখল স্টাডি টেবিলের চেয়ারে অম্লান বসে আছে। বাকিরা সবাই চলে গেছে বলেই মনে হয়। সবই তো ঠিক আছে! তাহলে ? স্টাডি টেবিলের ওপর তাকাতেই অদ্ভুত একটা তরঙ্গ অর্ক-র মাথার ভেতরে খেলে গেলো। জন্মদিনের কেক কাটা হয়নি। কয়েকটা মোমবাতি চারপাশে ঘিরে সাজানো আছে। জ্বালাবার জন্য দেশলাইয়ের বাক্স পাশে রাখা আছে। কেক কাটবার ছুরিটাও যত্ন করে পাশে রাখা আছে। খাটের একটা প্রান্ত ধরে রুমকি দাঁড়িয়ে আছে। মুখের ভাবে কিছু বোঝাও

যাচ্ছে না। মুখটা অন্যদিকে ঘোরানো। অর্ক আর কোনো জায়গা দেখতে না পেয়ে, খাটের ধার ঘেঁসেই বসে পড়ল। এখনো ওর মাথায় কিছুই ঢুকছে না। তাহলে কি অম্লানের সঙ্গে রুমকির কোনো মন কষাকষি হয়েছে ! প্রথমে অম্লান ই কথা বলল, 'তোর কি কাণ্ডজ্ঞানগুলোও আজকাল লোপ পেয়েছে ? এখন কটা বাজে ? কোথায় ছিলিস সন্ধ্যা থেকে ? তোর প্রত্যেকটা ঠেকে খুঁজে এসেছি –একটা জায়গাতেও তোকে পাইনি !' খুব জোরের সঙ্গে বলছিল অম্লান। অর্ক-র বোধের বাইরে দিয়ে যেন চলে যাচ্ছিল কথাগুলো। বাইরে তো ছিল অর্ক, তার সঙ্গে কেক না কাটার কি সম্পর্ক ! যার জন্মদিন সে বহাল তবিয়তেই আছে। অম্লানও আছে ! তাহলে ? হঠাৎই খেয়াল করল রুমকি এগিয়ে আসছে ওর দিকে। এরপরেই প্রমাদ গুনল অর্ক। ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল। চোখ বন্ধ হওয়ার আগে দেখল আগুন রঙের একটা সালোয়ার সেট পরেছে রুমকি। আঙুরের থোপার মতো চুলগুলোও যেন একটু বিন্যস্ত আজ। একদম রাজেন্দ্রাণীর মতো লাগছে ওকে !

চোখ বন্ধ অবস্থাতেই অর্ক অনুভব করলো ওর একদম কাছে এসে দাঁড়িয়েছে রুমকি। তারপরেই বুঝতে পারলো ওর মাথার চুলের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে নরম একটা হাতের স্পর্শ ! রুমকি ! রুক্ষ একটা মানুষের হাত এত নরম হয় কি করে ! কোনো অজানা কম্পাঙ্কে ভেসে আসছে অম্লানের গলার আওয়াজ আর হাসি, 'শিকারি খুদ ইঁহা শিকার হো গয়া ! আজ তুই নিজেই ধরা পড়ে গেলি রুমকি! ওই ইডিয়টটাকে বলেই দে তুই আর কারও কবিতার বই চাইছিস না। তুই শুধু কবি অর্কপ্রভ রায়ের কবিতার বই চাইছিস !' এইবারে চোখটা খুলে ফেলেছে অর্ক। অদ্ভুত একটা রামধনু তার চোখের সামনে। হাসছে রুমকি অথচ জলের একটা ধারা অর্ক-র হাতের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে। পকেটে হাত রেখেছে চকোলেট স্ট্রিপটা বার করার জন্য। কিন্তু শূন্য হাত ফিরে আসছে। তাকিয়ে দেখল তার আনা চকোলেট রুমকির অন্য হাতের তালুতে উষ্ণ হয়ে উঠছে তখন।

চক্রবাল রেখা ধরে ফিরে আসছে পাখিগুলো। এতকাল পরে। এতগুলো বছর পার করে ফিরে আসছে ওরা। উড়ছে... উড়ছে... বৃত্তাকারে, মাথার চারপাশে উড়ছে। কৃষ্ণগহ্বর থেকে উৎপন্ন হয়ে আসা ব্রহ্মাণ্ড শিশুর নরম আলোয় থই থই করছে আকাশটা। বৃষ্টির মত নেমে আসছে কবিতার ফোঁটারা :

তোমার আঙুল যখন স্পর্শ করলো আমার চেতনা
আমি অনুভব করলাম, সম্পূর্ণ হয়েছে বৃত্ত–
পালিয়ে যাবার মতো আর কোনো ফাঁক নেই কোথাও!
...আর আমার সমস্ত ইচ্ছেরা এরপর সূর্যমুখী হয়ে গেলো।
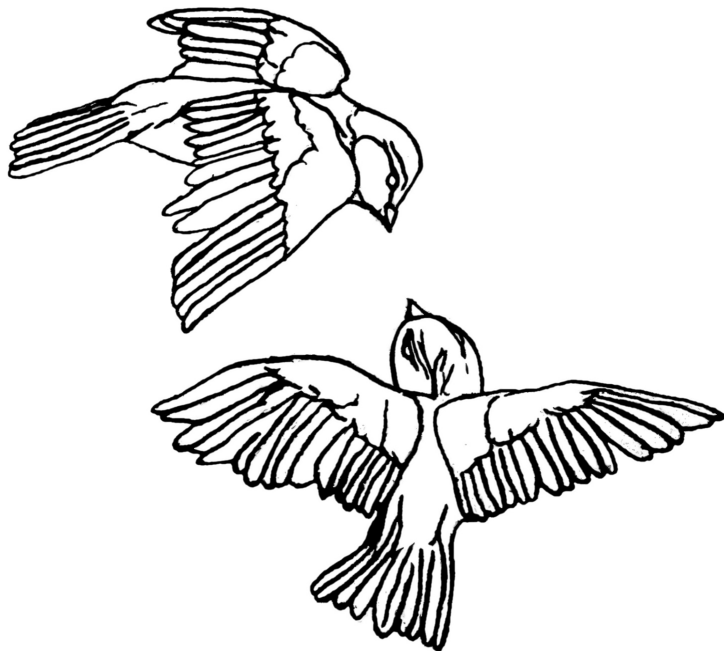
এসেছে সময়..

সৌমেন মন্ডল

এসেছে সময় লুপ্ত হওয়ার
সভ্যতার চরম সীমানা ধরে হেঁটে যাওয়ার।
বাকি থাকতে হবে বাকিটাকে
মেনে নিতে হবে চিরন্তন সত্যটাকে।
রয়ে যাবে গবেষনাপত্রগুলি সভ্যতার নিচে
বসন্তকে আবদ্ধ করবে ঋতুচক্রের গভীরতা।
অন্তিম পাতাটি ঝরে পড়বে
কালের নিয়ম মেনে।
তখনও হয়তো মনের খেয়ালে,
শিশুদের হাসিকান্নায় মুখরিত হবে
এই পৃথিবীর আকাশ বাতাস।
তখনও পৃথিবীর আবর্তন গতি
রাতের পরে দিনকে ডেকে আনবে।
কিন্তু সে ভোরের রবি আমাদের কানেকানে বলবে,
তৈরি হও সময় এসেছে লুপ্ত হওয়ার
সভ্যতার চরম সীমানা ধরে হেঁটে যাওয়ার...

পাহাড়ি

শিবাদিত্য দাশশর্মা

উঁচু টিলাটা ছাড়িয়ে মলি এখন বেশ কিছুটা বাড়ির পথে!
স্কুল তার ছুটি আজ। তাতে তোমার আমার কি?
ওই দূরে তিস্তা দৌড়চ্ছে মলির বাড়ির পাশে।
তাতেই বা তোমার আমার কি?
মলি রোডোডেন্ড্রনের পাশে সময় কাটায় রোজ।
খাদ ঘেঁষে হেঁটে চলে মলির ভাই
কলকাতা ঘুমায় তখন তাদের সুখের রাত।
লাচুঙ্গের কোন চূড়ায় বরফ পড়লে
কলকাতা সন্তোষকে টাকা দিয়ে ঘুরে আসে সোয়েটারে।
খুধাহীন রাতে রূপকথা থাকে গাঁজার দমে!
সাপ আঁকা রাস্তা ঘিরে মলি আর সন্তোষ প্রেম করে
গোলাপ নয় রোডোডেন্ড্রন দাবী তার।
সুখের বসন্তে যৌবন তিস্তার
কলকাতা গেছে সন্তোষ মজা ওড়াতে,
মলির ছেলের ছবি নিতে।
আমার দেশের বাইরে তারা অর্বাচীনের সমান,
তুষারপাতে আগুন জ্বলে দুঃখ তাদের শীতে।
রঙ্গিন গেলাস মজলিশে মেতে আমি তখন বিদেশ পাড়ি,
তিস্তা পাড়েই রোববার জীবন ছিল মলির,
পরিচয়হীন লেপচার দীর্ঘ রাতে পড়ল দাড়ি।

চিত্রগ্রাহক - সাখাওয়াত ইসলাম
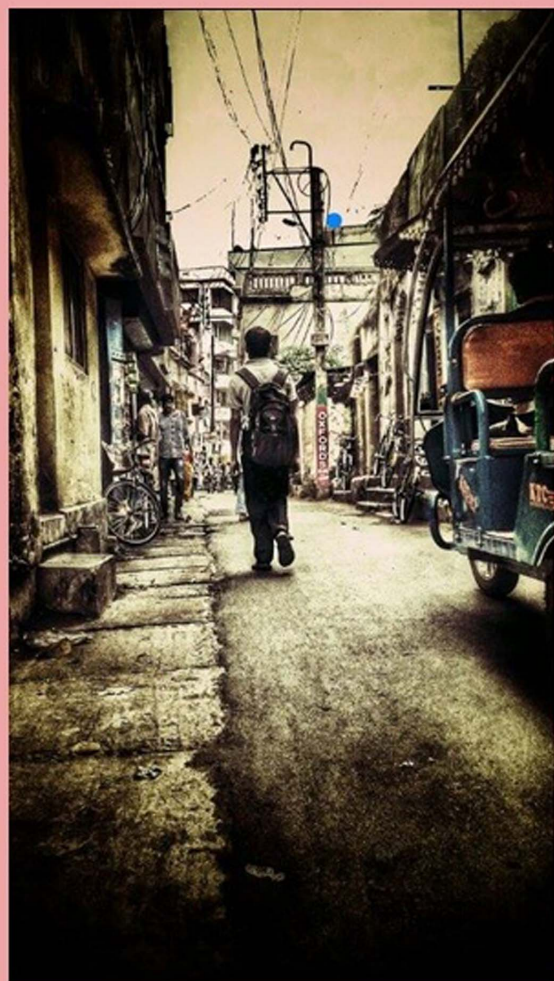
অলি গলি চলি রাম
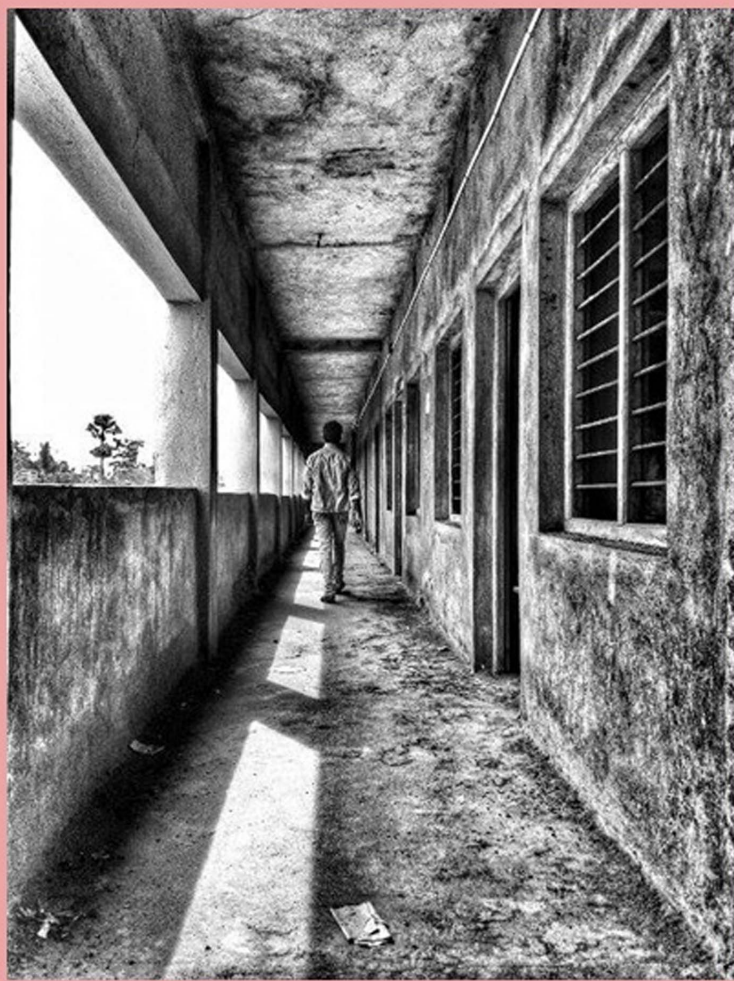
জীবনের পথ চলা
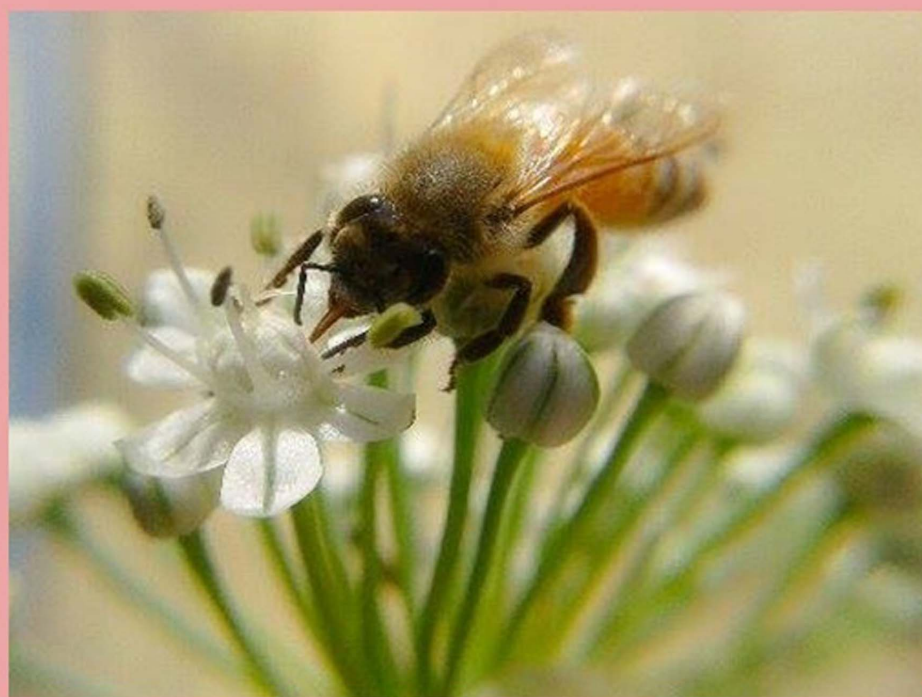
মধুচোর

নিশিবন্ধু

মোঃ আঃ মুকতাদির

আজ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে একবার ভেবে নিলাম আজ সারাদিনের কাজগুলো কি কি ? আমি 'নবনীল খামার বাড়ি প্রকল্প'-এর একজন কর্মচারী। আমার প্রধান কাজ হল হিসাবনিকাশ করা। এছাড়াও খামারের দরকারে আমাকে বিভিন্ন সময়ে নানা কাজ করতে হয়। তাই সকালবেলা দিনের করণীয় কাজগুলো নিয়ে না ভাবলে কোনোটা ছাড়া পড়তে পারে। পরে অন্য কাজের সাথে এই কাজটা যোগ হলে কাজের চাপ পড়ে।

'নবনীল খামার বাড়ি প্রকল্প' সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। এর আওতায় মূলত ৩টি ব্যবসার কাজ পরিচালিত হয়। রাইস মিল, ফলের বাগান, মাছ চাষ। পুরো ৮ বিঘা (১ বিঘা = ৩৩ শতক) জমির উপর এসব ব্যবসা পরিচালিত হচ্ছে। এসব ৩ রকম ব্যবসা পরিচালনার জন্য আলাদা ভাবে লোক নিয়োগ করা আছে। তবে সব রেজিস্ট্রার বুক আমার কাছে থাকে। আমিই সব রেজিস্ট্রার বুক দেখে থাকি।

আমার গল্পের খাতিরে যতটুকু বর্ণনা খামার বাড়ির দেবার দরকার ততটুকু দিচ্ছি। সমগ্র খামারবাড়ি উঁচু দেয়ালে ঘেরা।

৮ বিঘা খামারবাড়ির দরজা একটাই। খামারবাড়ির উত্তরের সদর দরজা দিয়ে ঢুকলে ডানপাশে নৈশপ্রহরী এবং দ্বাররক্ষকের ঘর আর বামপাশে অফিস ঘর। তারপর রাইস মিলের মেশিন ঘর। এখানে ধান থেকে চাল বের করা হয়। তারপাশে রাইস মিল শ্রমিকদের থাকবার ঘর বেশ কয়েকটি। তার সামনে ধান শুকানোর বিশাল চাতাল। চাতালের পাশ দিয়ে খামারবাড়ির দক্ষিণ অংশে যাবার রাস্তা রয়েছে। এই রাস্তা দিয়ে গেলে প্রথমে পড়বে ফলের বাগান। আরও ভিতরে গেলে চোখে পড়বে মাছ চাষের ৩-৪টা পুকুর। এসব রাইস মিল, বাগান, পুকুর দেখাশোনা করার লোকজন তাদের জন্য বরাদ্দ ঘরে থাকে। আমাকেও রাতে খামারবাড়িতে থাকতে হয়। আমার ঘর উত্তরে অফিস ঘরের দিকে। আমি বিকালবেলা আমার কাজ না থাকলে খামারবাড়ির দক্ষিণ দিকে পুকুর এবং ফলের বাগানে ঘুরে বেড়াই। বিকালটা দারুন কেটে যায়। মাঝে মাঝে পুকুর এবং বাগানের সন্ধিস্থলে একটা আমগাছের নিচের বেঞ্চিতে বসে থাকি। মোবাইলে গান শুনি বা ফেসবুক ব্যবহার করি।

গত কয়েকদিন ধরে রাতে একটা ব্যাপার ঘটছে। চৈত্রের দিন। সারাদিনের গরমের পর রাতের বাতাসটা দারুন লাগে। তাই রাত হবার পরও উঠতে মন চায় না। রাতের খাবার সেরে টর্চলাইট নিয়ে আবার সেখানে গিয়ে বসি। একদিন রাত ১০টা পর্যন্ত বসে থেকে উঠতে যাব এমন সময় দেখলাম আমার ১০ গজ দূরের একটা আমগাছের আড়ালে কে যেন লুকিয়ে গেল। ভাবলাম রাতের বেলা বাগান পাহারা দেবার লোক এসেছে। আমাকে দেখে হয়তো গাছের আড়ালে বিড়ি টানছে। নাম ধরে ডাকলাম। কোন সাড়া নাই। অন্ধকারের ভ্রম মনে করে আমি কিছু আর করলাম না।

পরদিন সারাদিনের কাজ সেরে বিকালবেলা আবার বসলাম। রাতে উঠতে যাব, আবার সেই গাছের আড়ালে লুকানোর ব্যাপারটা ঘটল। আমি পুকুর দেখাশোনা করবার লোক জসিম ভাইকে ডাকলাম-

আমি: 'জসিম ভাই ?'

জসিম: 'কি বলছেন, ভাই ?'

আমি: 'তুমি কোথায় ?'

জসিম: 'আমার ঘরে ?'

আমি: 'তুমি বাগানে এসেছিলে ?'

জসিম: 'আমি বাগানে যাব কেন ? একটু পরেই যাচ্ছি তো পুকুরের দিকে।'

আমি আর জসিমকে কিছু বললাম না। এভাবে বেশ কয়েকদিন চলতে থাকল ঘটনাটা। আমার মনে হচ্ছে শরীরটা দূর্বল, তাই অলীক কল্পনা করছি। বেশ করে ভাল খাবার খেতে হবে কয়েকদিন। পরদিন রাতে আবার সেখানে বসলাম। মনকে সত্য ঘটনা না জানালে মনটা বড় অসুখে পড়তে পারে। রাত ১০.৩০ বাজলো। চৈত্রের রাতে খোলা বাগানের হাওয়া গায়ে শিরশিরে অনুভূতি দিচ্ছে। বেশ বুঝতে পারলাম আমি জেগে আছি আর বেঞ্চের অন্য পাশে বসেছে এক ছায়ামূর্তি, যার অবয়বে বুঝতে পারছি ৪০ বছর বয়সী মহিলা। আমি তাকানো মাত্র আমার হার্টবিট বেড়ে গেল। বুঝতে পারছি আমার সাহস কমে আসছে। আমার হাঁটুর জোরও কমে গিয়েছিল। আমি না দৌড়ে যতখানি সম্ভব হেটে আমার ঘরের দিকে ছুটছি। নৈশ প্রহরী আমার ঘরের কাছে আসামাত্র আমাকে দেখতে পেয়ে বলল, 'এনিথিং রং স্যার ?' আমি বললাম, 'প্রকৃতির ডাক'। সে চুপ মেরে গেল।

রাতে বিছানায় শুয়ে ভাবতে লাগলাম, কি থেকে কি হল ? যা দেখলাম ঠিক দেখলাম? পরদিন ভাবলাম সত্য না জানলে আমার শরীর খারাপ করবে আর ছায়াটা যখন এতদিন আমার ক্ষতি করেনি তখন ভয় নাই।

পরদিন রাতে বসে আছি সেই জায়গায়। পুকুরের কেয়ারটেকার জসিম তার ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে। টের পেলাম আমার বেঞ্চের অন্য পাশে বসেছে অন্য কেউ। গতকালের পর বোধহয় আজকে আমার সাহস বেড়েছে।

আমি বললাম, 'বুঝতে পারছি, আরেকজন আছেন। আপনার যদি আমার ক্ষতি করার উদ্দেশ্য না থাকে তবে আমরা বন্ধু হতে পারি?'

ছায়া: 'আমার সাথে মানুষের বন্ধুত্ব হতে পারে না।'

আমি: 'আপনার পরিচয় জানতে পারি ?'

ছায়া: 'আমার পরিচয় পরে হবে। তুমি কে ? রোজ এখানে বসে থাক যে ?'

আমি: 'আমি এ খামার বাড়ির হিসাবরক্ষক।'

ছায়া: 'হাহাহাহাহাহা...........।'

আমি দেখলাম এ যে সাক্ষাৎ ভূতের মত হাসছে !!!

ছায়া: 'তুমি হিসাব রক্ষক ? তবে আমার জীবনের হিসাব মিলিয়ে দাও।'

আমি: 'আগে তো বলুন, আপনি কে ?'

ছায়া: 'আমি পাশের তেলিপুর গ্রামের জমসেদ উদ্দিনের স্ত্রী।'

আমি: 'আপনি তো মানুষ না বুঝতে পারছি। তবে এখানে আসেন কেন ?'

ছায়া: 'সে পরে বলবো আমার জীবনের ঘটনা। আজ আসি.....।'

বলে ছায়াটা যেন নড়ে গেল। তারপর দেখলাম ছায়ামূর্তি হেঁটে হেঁটে বাগানের দক্ষিণ দিকে গেল।

আমি পরদিন বিকেলের মধ্যে আমার কাজগুলো সেরে গেলাম খামারবাড়ি থেকে ২ কিলোমিটার দূরে তেলিপুর গ্রামে। উদ্দেশ্য জমসেদ উদ্দিনের সাথে কথা বলা এবং তার স্ত্রী মারা গেছে কিনা তা জানা। গ্রামে ঢুকে ৩-৪জনকে বলে খুঁজে বের করলাম জমসেদ উদ্দিনের বাড়ি। বাড়ির ভেতর ঢুকতেই মনে হল জমসেদ উদ্দিন আমাকে চেনে। চিনতে পারে, খামারে হয়তো দেখেছে।

জমসেদ বলল, 'ছেলেটার আক্কেল হল না। আপনি আসছেন, আমাকে একবার বলবেনা ?'

আমি: 'কার কথা বলছেন ?'

জমসেদ: 'আরে, আমার ছেলে জসিম।'

আমি বুঝতে পারলাম আমাদের পুকুরের কেয়ারটেকার জসিমের কথা বলা হচ্ছে। আমাকে চেনার ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। আমি বললাম, 'আমি তাকে বলে আসিনি। এমনি হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছি। এসে শুনলাম আপনাদের বাড়ি এখানে তাই দেখে গেলাম।'

পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে পেঁচিয়ে যাচ্ছে। ছায়াটা বলল সে জমসেদের স্ত্রী, জমসেদ বলছে জসিম তার ছেলে।

আমি জমসেদকে বললাম, 'জসিমের মাকে দেখছিনা যে?'

জমসেদ বলল, 'জসিমের মা মারা গেছে আর আমার ২য় পক্ষের স্ত্রী বাইরে গেছে। একটু পরে ফিরবে।'

তারপর আমি আর কিছুক্ষণ দেরি করে জমসেদের বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে খামারে এলাম। ছায়াটা তাহলে জসিমের মা। মনটা কেমন অস্থির লাগছে। সেদিন রাতে আর বাগানে গেলাম না। পরদিন জসিম কে ডেকে কাছে বসালাম—

আমি: 'জসিম, কাল তোমাদের বাড়িতে হাঁটতে হাঁটতে গিয়েছিলাম। তোমার বাবাকে দেখলাম।'

জসিম: 'শুনলাম। সকালবেলা বাবা বলল।'

আমি: 'তোমার মাকে দেখলাম না কেন ?'

জসিম: 'আমার নিজের মা মারা গেছে। মার শরীর খারাপ ছিল। বাবা আবার বিয়ে করেন।'

আমি: 'তোমার মা কবে মারা যান ?'

জসিম: 'আমার যখন আট বছর বয়স তখন থেকে মা অসুখে পড়েন। আমার দশ বছর বয়সে মা চলে যান।'

আমি: 'তোমার মার চিকিৎসা করান হয়নি ?'

জসিম: 'ছোটবেলার কথা অত মনে নাই। চিকিৎসা হলেও হতে পারে, নাও হতে পারে। গরিব ঘরের মেয়েদের অত চিকিৎসা হয়না'

আমি দেখলাম জসিমের চোখে পানি এসে গেছে।

আমি: 'চিকিৎসা করানো হয়না এ কেমন কথা ?!!'

জসিম: 'আসলে আমার মায়ের বড় বোন আমিরুন মাসির কাছে শুনেছিলাম মায়ের শরীর খারাপ হবার পর বাবা-মায়ের দাম্পত্য জীবন বন্ধ ছিল। বাবা, মা বেঁচে থাকতেই আবার বিয়ে করেন। মা এটা সহ্য করতে পারেননি। আমার মা শ্বশুরবাড়িতে আর থাকেননি। নিজের বাবার কাছে আসেন। মা ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেননি। দুবছর পর চলে যান।'

জসিমের কাছ থেকে ঘটনাটা শুনে মন খারাপ হয়ে গেল। জসিমকে বললাম, 'জসিম মন খারাপ করনা। পৃথিবীর সব মানুষ সব কিছু পায়না। তুমি তোমার মাকে পাওনি। দেখ আরেকজন অন্যকিছু পায়নি।'

আজ রাতে আমি গেলাম সেই বাগানের বেঞ্চিতে। এরপর আসলেন আমার নিশিবন্ধু-

আমি: 'আপনার নাম কি তবে ?'

ছায়া: 'মেহেরুন।'

আমি: 'আমি জসিমের কাছ থেকে সব জেনেছি।'

মেহেরুন: 'আরো কিছু জানবে আজকে। আমার ছেলে সব জানেনা। জসিমের বাবা এখন যাকে বিয়ে করেছে তাকে পছন্দ করতো সে। আমার অসুস্থতার সুযোগে সে তাকে বিয়ে করেছে। আমার চিকিৎসা করেনি সে। আমার তাতে

আফসোস নাই। কিন্তু সে জসিমকে লেখাপড়া শেখায়নি। তাহলে তাকে আজ খামারের পুকুর রক্ষক হতে হত না। এখন তুমি বল আমার জীবনের হিসাবের ফলাফল কি ?’

আমি: ‘বুঝতে পারছি মেহেরুন, আপনি অনেক কষ্ট পেয়েছেন। আপনার জীবনের হিসাব করলে ফলাফলে কষ্টই হয়ত বেশি হবে।’

মেহেরুন: ‘আমি কষ্ট পেয়েছি। আমি কষ্ট পেয়েছি।’ আমি দেখলাম মেহেরুনের ছায়া ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আবার বলতে শুরু করল, ‘কিন্তু আমার সন্তানকে কষ্ট পেতে দেব না। আমার সন্তানের পেছনে লোক লেগেছে। তারা আমার জসিমকে ফাসাতে চায়। আমি জেনেছি তারা নিজেরা খামারের সব মাছ চুরি করবে আর দোষ পড়বে পুকুর কেয়ারটেকার আমার জসিমের উপর। আমি কিছুতে তা হতে দেবনা। প্রতি রাতে চোখ রাখছি পুকুরের উপর। তোমার সাথে অনেক কথা হল,আজ আসি....।’

এরপর দেখলাম ছায়াটা বাগানে অন্ধকারে মিলে গেল। আমি ঘরে ফিরে নি:শ্বাস ফেললাম। সব জেনে গেছি। আজ আমার ঘুম ভাল হবে। তবে মেহেরুনের করুণ পরিণতির কথা ভেবে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

মাঝরাতে খামারবাড়ির দক্ষিণ অংশ থেকে চিৎকার চেচামেচির শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে সব ঘটনা জানতে পারলাম। জসিমকে বেঁধে ডাকাতরা মাছ চুরিতে এসেছিল। ডাকাতদের চিৎকারে মিলের শ্রমিকরা এসে দেখে ডাকাত চারজন অজ্ঞান। যাই হোক নৈশপ্রহরীর চোখ ফাঁকি দিয়ে ঢোকা ডাকাতরা চিৎকার করে কেন লোক জানাজানি করতে গিয়েছিল, এ কথা কেউ বুঝতে পারলনা। বন্দি ডাকাতদের পরদিন জ্ঞান ফেরবার পর অনেকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করল কিন্তু তারা কোন কথা বলতে পারলো না। আসলে তাদের বাকশক্তি ছিল না। মনে মনে বললাম আমার নিশিবন্ধু মেহেরুন ছেলের শত্রুদের হাড়ে হাড়ে শিক্ষা দিয়েছে। ♦♦♦

প্রবাসীর চিঠি

সম্মিতা

আমার প্রিয় শহরকে,

আমার শহরটা প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে এক গহন গভীর অন্ধকারে। এভাবে কোনো দিন দেখিনি। ভাবিনি দেখব তাকে। আমার শহরটা ছিল খুব সুন্দর... প্রচুর পাখি আসতো গাছে। শরৎ-এর আকাশে ভেসে বেড়াত পেজা মেঘ। সেই নীল আকাশটাকে আমি খুব দেখতে চাই আবার। কিন্তু পাইনা... ধোয়াশা, কুয়াশা, ধুলো, দূষণ সব কিছুতে আমার শহর ছেয়ে গেছে। আমার শহরে রয়েছে আমার ছোট্ট বাড়ি। সেই বাড়ি, সেই স্বপ্নগুলোই সব আমার কাছে। এই শহরে থেকেই আমি স্বপ্ন দেখতে শিখেছি। লিখতে শিখেছি কবিতা। নিজেকে চিনতে শিখেছি... ভালোবাসার মানুষ খুঁজে পেয়েছি... ভালোবাসতে শিখেছি... অনেক দূর... অনেক দূরে হেঁটে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছি... আমি এখন অন্য একটি শহরে রয়েছি... আমার শহর থেকে অনেক অনেক দূরে... ঠিক যেন এ এক রূপকথার গল্প... যেমন করে রাজপুত্রের সাথে রাজকন্যা পক্ষিরাজে চেপে সাত সমুদ্র তের নদী পার করে... তেমনি করেই আমি এখানে এসেছি... এই নতুন শহরে... এবার এই শহরের কথা কিছু বলি...।

এখানে ঘুম ভাঙলে বিছানাতে শুয়ে শুয়েই নীল আকাশ দেখতে পাই। সেখানে খেলা করে তুলো মেঘের দল। যেন হাত বাড়ালেই ধরতে পারব তাদের... সূর্য এখানে অনেক দেরিতে বাড়ি যায়। কারণ এখন গ্রীষ্ম কাল, তবে সেই দহন উত্তাপ নেই। উষ্ণতা আছে পাখিদের মনে। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যায় সবুজ টিয়ার দল, উড়ে যায় জানালার পাশ দিয়ে... দুটো কাক প্রেম করে রোদমেখে ব্যালকনিতে... এক নাম না জানা পাখি এক মনে বসে থাকে ফ্ল্যাটের ছাদে। আমি তার চোখে দেখেছি ভালো থাকার ঝিলিক... আমি চাই না এই ভালো থাকাটা নষ্ট হয়ে যাক। শীত পড়লে এই শহরটা বরফে ঢেকে যায়। ঝড়ের মত বয়ে যায় শীতল হওয়া। বাড়ির জানালা, বারান্দা, ছাদ সবই তখন বরফে সাদা। তার উপর সূর্যের আলো পড়লে তা চক চক করে। ক্যানেলের জল জমে যায়। হাঁসেরা আর ভাসতে পারে না। ছোট খরগোসেরা লুকিয়ে যায় গর্তে। আমি থাকি আমার ভালবাসার সাথে। এই অনুভূতিটা একদম অন্যরকম। সব মানুষের জীবনেই এই দিনগুলো আসে। আর সেই সব কিছু হয়ে যায় ধীরে ধীরে। এক দিন আমরা ফিরে যাব আমার সেই পুরোনো শহরে... কিন্তু জানি না তা কবে... জানি না তখন আমার শহর কেমন থাকবে ? তবে আমার স্বপ্ন সে আবার সুন্দর হবে। আরো সুন্দর হবে। আমি পরিজায়ী আর সার্থপরও নই। তাই আমি ফিরব। আমার বিশ্বাস কিছুটা আশার আলো ঠিক দেখব পূব আকাশে... আমার শহরও অনেক অনেক দূর এগিয়ে যাবে সমস্ত শহরকে ফেলে। আমি আছি তোমার সাথে। আমি আছি তোমার পাশে। শহর তুমি সুস্থ থেকো... ভালো থেকো... আমি আসব ফিরে এই বাংলার মাটিতে...।

ইতি

এক প্রবাসী

চিত্রশিল্পী - স্বর্ণেন্দু ভট্টাচার্য্য
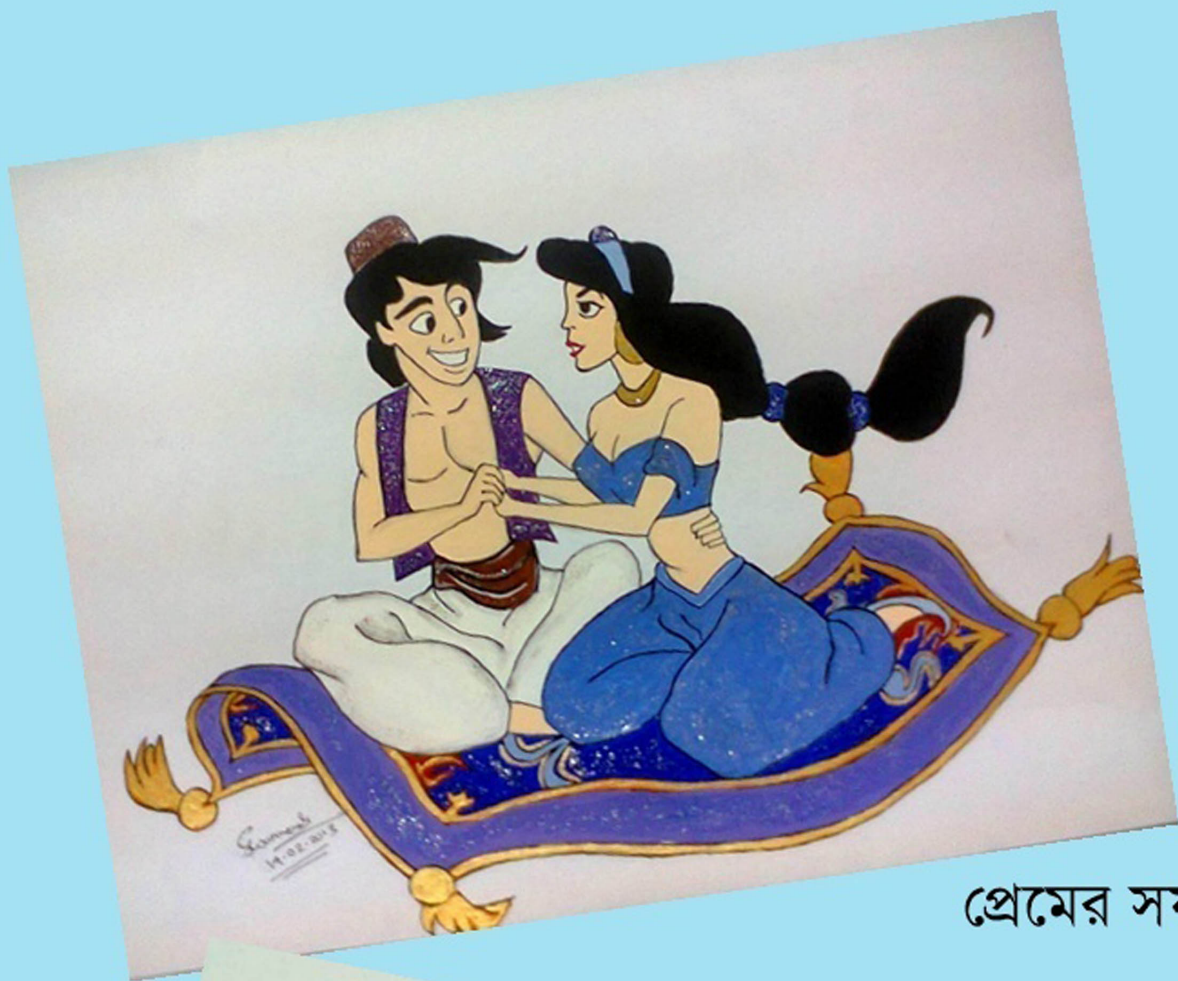
প্রেমের সফর

সুপ্ত স্বপ্ন

দ্বৈতসত্তা

সোমনাথ আচার্য্য

“এক্সকিউজ মি !...আপনি মিঃ সিধু সেন না..?”

-“উহু! নট্ এগজ্যাক্টলি !” সিদ্ধার্থ সেনের জবাবে যুবতীটি খানিক অপ্রস্তুত হয়ে গেলো।

-“ওহ্ স্যরি ! আই মিন...আই ওয়ন্ট টু সে...আর ইউ...”

-“সিদ্ধার্থ সেন। হুম ইউ আর লুকিং ফর। সিধু ইজ মাই নিকনেম...দ্যাট আই ইউজ ওনলি হোয়েন আই রাইট সামথিং।” কথাটা বলে মুচকি হাসলো সিদ্ধার্থ সেন।

-“ওহ্ মাই গড ! আপনি তো দারুণ সেন্স অফ হিউমর ক্যারি করেন। রাইটাররা জেনারেলি সিরিয়াস হয় বলেই জানতাম।” বললো মেয়েটি।

-“আমি এইরকমই। আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন ? ইউ ক্যান সিট হিয়ার।”

-“না...মানে...আপনার যদি কোনো প্রবলেম না থাকে তবে বসতে পারি।”

-“আপাতত তো কোনো প্রবলেম নেই। আমার এক বন্ধু আসবে। তারই অপেক্ষা করছি।”

-“সেম হিয়ার। আমারও বান্ধবীরা আসবে। গড়িয়াহাটে একজন বান্ধবীকে পিক আপ করে ওরা আসছে। তাই একটু

দেরী হচ্ছে।" বলতে বলতে মেয়েটি সিদ্ধার্থর উল্টোদিকের চেয়ারটায় বসলো। সিদ্ধার্থ দুটো কফির অর্ডার দিলো।

-"ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড...আপনার নামটা কিন্তু জানা হয়নি এখনো।"

-"আমি পল্লবী মল্লিক।"

-"তা সিধু সেনকে চিনলেন কি করে ?"

-"কেন..! ফোটো দেখেছি। বইয়ের ব্যাক কভারে।"

-"ওইটুকুই ? লেখাগুলো পড়েননি ?"

সিদ্ধার্থের কথায় পল্লবী হেসে উঠলো। সিদ্ধার্থ কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকে ওর দিকে।

-"আপনি ফোটোতে যতটা হ্যান্ডসাম দেখতে, লেখাতে ততোটাই স্মার্ট। আপনার মোটামুটি সব লেখাই আমার পড়া। আজকালকার ইয়াং জেনারেশন আপনার মতো একজন ইয়াং রাইটারের লেখা লাভস্টোরি পড়েই তো প্রেম করতে শিখছে।"

-"একটু ভুল বললেন।"

-"কি রকম ভুল ?"

-"লেখাগুলো আমার নয়, সিধু সেনের।"

-"হ্যাঁ, তো ? সে তো আপনারই নাম।"

-"একজন রাইটারের নানারকম রোখ থাকতে পারে, জানেন তো ? অন্যদের কথা জানি না, তবে আমার আছে।"

পল্লবী বললো, "কিরকম রোখ ?"

সিদ্ধার্থ বললো, "আমার কাছে সিদ্ধার্থ আর সিধু দুজন সম্পূর্ণ আলাদা সত্তা। অথচ দুজনে একে অপরের পরিপূরক। দুজনের কাজ সম্পূর্ণ আলাদা। সিদ্ধার্থ জোগাড় করে রসদ। আর সিধু সেই রসদ থেকে নির্যাসটুকু ছেঁকে নিয়ে কাহিনি তৈরী করে। তারপর আবার সিদ্ধার্থর দায়িত্ব সেই কাহিনিকে ভাষায় রূপদান করা।"

-"যতই হোক। মেইন হার্ড ওয়ার্ক তো সিদ্ধার্থকেই করতে হয়। কনস্ট্রাকটিভ ক্রেডিট তো তারই। সিধু সেনকে তো আপনি ছাড়া কেউ দেখতে পায় না।"

কথার মাঝে ক্যাফেটেরিয়ার ওয়েটার দুটো ব্ল্যাক কফি টেবিলে সার্ভ করে দিয়ে গেল। সিদ্ধার্থ পল্লবীর কাপটা এগিয়ে দিয়ে নিজেরটায় চুমুক দিয়ে বললো, "মিস মল্লিক, আপনি বোধহয় ব্যাপারটা ঠিক বুঝলেন না। ধরুন, একজন ব্লাইন্ড মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্ট রাইটারের হেল্প নিয়ে পরীক্ষা দিলো। রেজাল্ট বেরোনোর পর দেখা গেল সেই স্টুডেন্ট লেটার মার্কস পেয়েছে। তখন কিন্তু রাইটারের ক্রেডিট কেউ দেবে না। সে শুধু নিজের কাজ করে দিয়ে সরে গেছে। পড়াশুনার যাবতীয় কাজ কিন্তু স্টুডেন্টটাই করেছে। আমার ব্যাপারটাও এখানে তাই।"

-"বুঝলাম। ইউ মিন...আপনার রাইটার হিসেবে এই এতো খ্যাতি শুধুমাত্র সিধু সেন হিসেবে। আপনার ইমাজিনারি সোওল-ই আসল লেখক। সিদ্ধার্থ সেন ইজ জাস্ট আ ড্রাইভার। য়্যাম আই রাইট ?"

-"এবসোলিউটলি রাইট।"

-"তাহলে যদি ধরুন আপনি কারোর প্রেমে পড়েন, তাহলে আপনার দ্বিতীয় সত্তার সাথে পারবেন সেই ভালোবাসা শেয়ার করে নিতে ? এতে সিধু আর সিদ্ধার্থর মধ্যে কন্ট্রাডিক্টরি রিলেশন হয়ে যাবে না ?"

পল্লবীর কথাটা বেশ মনে ধরলো সিদ্ধার্থর। মেয়েটা তো বেশ প্রাসঙ্গিক কথা বলেছে। এই কথা তো কখনো ভেবে দেখেনি সে। সে তো নিজেই বলেছে সিধু আর সিদ্ধার্থ পরস্পরের পরিপূরক হয়েও তাদের সত্তা বোধ আছে। দুই সত্তা'র প্রকৃতি দুরকম। সিদ্ধার্থ তো নিজেই তার দ্বিতীয় সত্তার সাথে নিজেকে মিশিয়ে রাখতে পারে না। এমনকি কখনো সিধুর ওপর জোর খাটায়নি সিদ্ধার্থ। কিন্তু এখন এই পরিস্থিতিতে কি উত্তর দেবে সিদ্ধার্থ, তা ভেবে পায় না। কিছুক্ষণ ভেবে সে উত্তর দেয়, "আমি তো কখনো প্রেমে পড়িনি। শুধুমাত্র অন্যদের প্রেম করতে দেখেছি।"

-"তাহলে বুঝতেই পারছেন আপনার ইমেজিনারি সোওল কিরকম ভাবে আপনার ওপর ডমিনেট করছে। আপনি লেখার রসদ জোগাড় করে তাকে দিচ্ছেন, কিন্তু সেই রসদকে রীতিমতো উপভোগ করে যাচ্ছে আপনার ভিতরের সিধু সেন। রক্তমাংসের সিদ্ধার্থ সেন খ্যাতি-অর্থ পেয়েও নিঃস্বই থেকে যাচ্ছে। ভালোবাসতে চাইলেও ভালোবাসতে পারছে না। আপনি হয়তো ভাবছেন, আপনি সিধু সেনকে ইউজ করছেন। কিন্তু হচ্ছে আসলে উল্টোটা। একটা অদৃশ্য সত্তা'র দাস হয়ে নিজেকে নেগলেক্ট করে চলেছেন এতোদিন ধরে। তার চেয়ে বরং সিধু আর সিদ্ধার্থকে এক করে দিন না। দেখবেন আর নেগলেক্টেড হবেন না।"

পল্লবীর কথাগুলো মন দিয়ে শুনতে শুনতে ভাবে সিদ্ধার্থ। তার মতো একজন প্রথম সারির রোম্যান্টিক নভেলিস্টের মন কি অসাধারণ ভাবে চিনেছে মেয়েটা। সিদ্ধার্থ আচমকা

প্রশ্ন করে বসে, "আপনি কি প্রেম করেন ?"

পল্লবী বেশ চমকে উঠে বলে, "না তো। কেন ?"

-"না এমনিই। তাহলে নায়িকা হবেন ?"

-"কিসের নায়িকা ?"

-"সিধু...মানে সিদ্ধার্থ সেনের নেক্সট নভেলের। ফিল করছি, আপনার কথায় দুটো সত্তা আজ এক হয়ে যাচ্ছে। কথা দিলাম, আজ থেকে সিধু আর সিদ্ধার্থ একজনই।"

সিদ্ধার্থর মুখের প্রচ্ছন্ন হাসি পল্লবীর চোখ এড়ায় না।

-"আর সেই নভেলের নায়ক কে হবে জানতে পারি ?" পল্লবী মুচকি হাসে।

-"রক্তমাংসের সিদ্ধার্থ সেন হলে আপত্তি আছে কি ?"

পল্লবী লাজুক চোখে নিজের পছন্দের লেখকের দিকে তাকায়। লোকটার চোখে তখন দ্বিধা মাখানো একটা আবেদন ঝিলিক দিচ্ছে। পল্লবী কয়েক মুহূর্ত কিছু যেন চিন্তা করে একটু হাসলো। তারপর নিজের মোবাইল নম্বরটার সাথে একটা নোটপ্যাড এগিয়ে দিয়ে বললো, "ওয়ান অটোগ্রাফ প্লিজ !" ♦♦♦
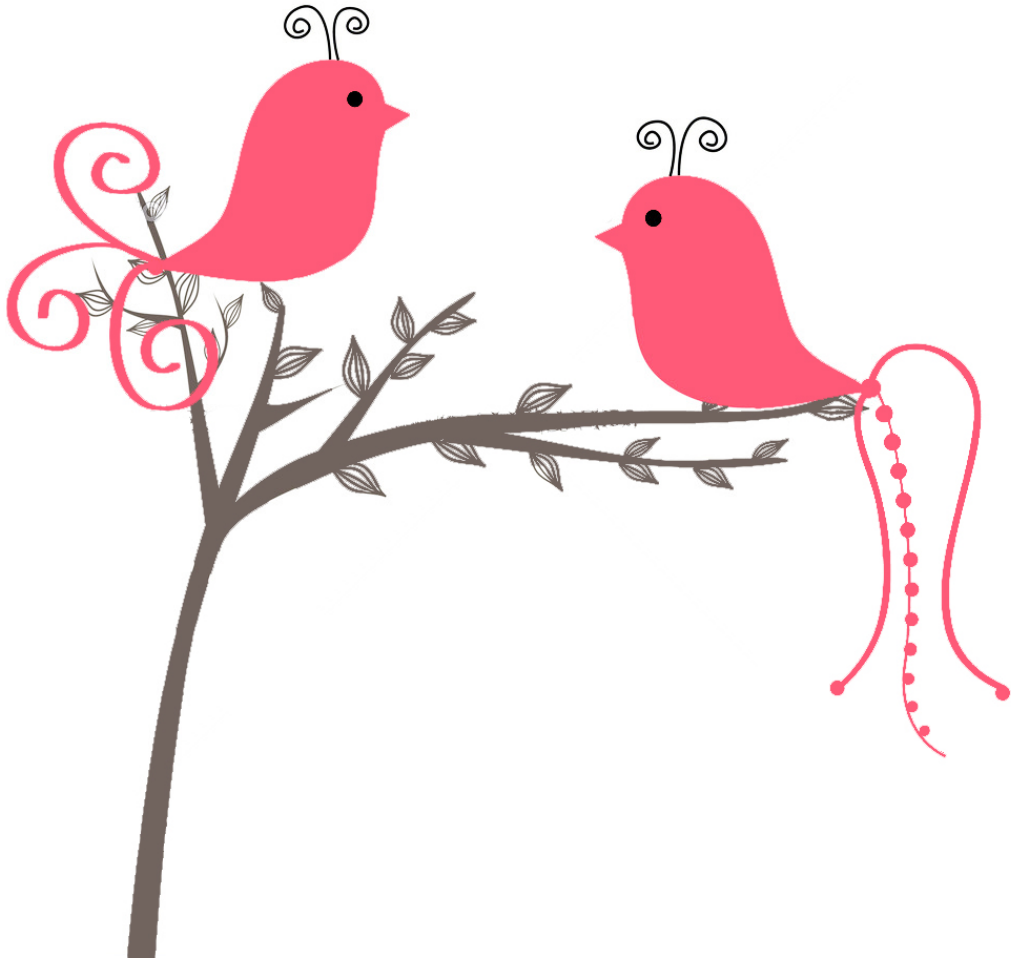
এখানে সূর্য ডোবে রাত ন'টার পরে

শ্রীপর্ণা দাশ ব্যানার্জী

এখানে সূর্য ডোবে রাত ন'টার পরে
তোমার সাথে গোধূলি লগ্নে গল্প করার সময় এখন অনেক।
আজ কোনো কাজ নেই আমার। ছুটি নিয়েছি অনেকদিন হল।
কতদিন ধরে ভেবেছি তুমি আসবে,
কতদিন তোমার কাছে গেছি, তোমায় ডাক না দিয়েই ফিরেছি,
তুমি রাগ করবে বলে ফিরে গেছি বারবার।
অনেক পাওনা অনেক হারানো জমা হয়ে আছে মনের কোনে,
কেউ জিজ্ঞেস করেনি তোমার মতো করে – ভালো আছি কিনা।
এক পেয়ালা চা আর একটুকরো কাগজ আর কলম – সবাই হাসে আজকাল,
কবে যে এতটা সময় বয়ে গেছে অনুভবই করিনি।
আজ একা বারান্দা এক গ্লাস ওয়াইন আর হাতে আইপ্যাড...। তবুও তোমাকেই মনে পড়ছে।
আকাশের রঙ বদলাচ্ছে রক্তিম আভা ছেড়ে এখন কালচে নীলাভ।
হাতে আর অল্পসময় ...বলতো কোথয় শেষ হয়েছিল আমাদের শেষবারের গল্প ????
অনামিকা ...।

কোনো একদিন কথা হয়েছিল

অয়ন দত্ত

কোনো একদিন কথা হয়েছিল
যখন দোল দোল হলুদ রোদ্দুর নামতো প্রাণের ইশারায়
যখন তরঙ্গ থেকে বেরিয়ে ছুটে চলতো নদী
নির্বোধ বিশ্বাসে ঐকান্তিক ভালবাসায় পরাভব সাগরের দিকে।
কোনো একদিন কথা হয়েছিল
যখন দিগন্তে দেখি ফুটে আছে ভয়ানক মুগ্ধতা
যখন প্রাচীন দেবতা হৃদয়ের খুব কাছাকাছি করতাল বাজিয়ে বলেছিল
সম্পূর্ণ সমর্পিত বোধ নিয়ে গাও অলকানন্দার গান।
কোনো একদিন কথা হয়েছিল
যখন শেষ রাতে ফোটা গন্ধরাজ জেগে ছিল একা
যখন প্রায় মৃত জোছনা তখনও আড়ি না দিয়ে এসেছিল বাড়ী
হিমশীতল আলতো অন্ধকারের কবলে মিশে যাচ্ছিল আমাদের যুগ্ম শরীর।
কোনো একদিন কথা না বলার কথায়...কোনো অভিমান রাখিনি অনুসঙ্গী
যখন আকাশের গায়ে নক্ষত্র মেলা...মেঠোপথে তুই আর আমি নিঃশব্দ ছায়াসঙ্গী।

আঘাত

ঋজু পাল

"দাগ হেয় দিল মে লাখো গেহেরে হায়ে
নয়ন মে আপনে কজরা না ঠেহেরে।
সপনো মে আকে মিলাকে সাতানে হায়ে
কাহি শাওন বারস গায়ে সাজনা।।"

জানলা দিয়ে ঝিরিঝিরি বৃষ্টির স্পর্শ পেয়ে ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, ইসস এতক্ষণ ঘুমাচ্ছিলাম !!! কাল থেকে শরীরটা বড্ড ভোগাচ্ছে। ডাক্তার দেখাতে গেলেও একগাদা খরচা এখন।

'সুন্দর বটে তব অঙ্গদ খানি তারায় তারায় খচিত...।।'

-'হ্যালো' !

-কি ব্যাপার, তখন থেকে ফোন করে যাচ্ছি, তুলছিলে না কেন ?

-'একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, শোন না বলছি আজ আর...।'

-না না, এখন কোন বাহানা দিও না, রেডি হয়ে নাও, ঠিক সাতটায় ক্লায়েন্ট আসবে।

-'হুম, রাখছি !'

এ এমন একটা দুনিয়া যেখানে কোন ওজর খাটে না, দরকার পড়ে না চেনা জানার, ধর্মের অনুশাসনও বোধহয় নিষেধের চোখ রাঙাতে থমকে যায়। গলফগ্রীন এর এই বিলাসবহুল ফ্ল্যাটেই বোধহয় বাকি জীবনটাও কাটাতে হবে। আমার আমিত্ব হারিয়ে আজ আমি শবনম, যার একপলকের চাহনিতেই ঘায়েল হয়ে যায় পুরুষের পাষাণ হৃদয়।

স্মৃতি থেকে এখনো মুছে যায় নি পুরোপুরি অতীতের সাদা কালো দিনগুলো। উচ্চমাধ্যমিক পাস করে চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম কোলকাতার আনাচেকানাচে। ঘরে অসুস্থ মা, স্কুল পড়ুয়া ভাই। স্বচ্ছলতা তো দূরের কথা, নুন-ভাত জোটার দিনও ফুরিয়ে আসছিল। সধবা হয়েও বিধবা মা এতকাল রান্নার কাজ করে সংসারের হাল ধরেছিলেন, তাও আর সম্ভব ছিল না এখন। বাবা কে কোনদিন চোখে দেখি নি, এক মায়ের সিন্দুকে থাকা ফটোটা ছাড়া। কেন বাবা তাদের সঙ্গে থাকেন না, সেই সদুত্তর কোনোদিনই পাই নি মায়ের থেকে ! প্রতিবেশীদের ধারের তাগাদা, বাড়িওয়ালার খারাপ ব্যবহার, অভুক্ত ভাইটার শুকিয়ে যাওয়া মুখ ....একটা চাকরি দরকার ছিল, ভীষণ ভাবে। আজকালকার দিনে গ্র্যাজুয়েট না হয়ে চাকরি পাওয়া যে দুষ্কর সেটা ক্রমশ বুঝতে পারছিলাম, তবুও...।।

কলেজ স্ট্রিট-এ একদিন একটা বইয়ের দোকানে কল সেন্টারের বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে, যৎসামান্য মাইনেতে যোগ দি অফিসে। মাসের শেষে যা পেতাম বাড়িভাড়া, সংসারের খরচ, ভাইয়ের পড়ার খরচ কিছুই কুলতো না ! ইতিমধ্যে জলাঞ্জলি দিয়ে ফেলেছিলাম নিজের সব স্বপ্নকে, মায়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও পড়াটা ছাড়তেই হল।

অফিসেই একদিন আলাপ হয় বিক্রমের সাথে। একজন সতেরো বছর বয়েসের মেয়ের জীবনে সেই প্রথম পুরুষ যাকে নিজের সব সমস্যার কথা খুলে বলতে পারতাম। ওকে আমার জীবনের আশীর্বাদ বলবো, না অভিশাপ বলবো জানি না, আমার আজকের জীবনে প্রবেশ তো ওর হাত ধরে। ঘেন্নায় কুঁকড়ে গেছিলাম একসময় ওর প্রস্তাব শুনে, চেয়েছিলাম সব সম্পর্ক ত্যাগ করতে। পারি নি, টাকার লোভ একটু একটু করে গ্রাস করতে শুরু করে দিয়েছিল আমায় ...হয়ে উঠলাম শবনম। তারপর আর কি ? বিক্রমের ফ্ল্যাটে থাকা, একের পর এক ক্লায়েন্টকে মনোরঞ্জনের দুনিয়া তে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া, কড়কড়ে নোট! আজকাল গ্রামের বাড়িতে মাস গেলে যে পরিমাণ টাকা পাঠাই তাতে দুটো অসহায় মানুষের জীবন বোধকরি হেসে খেলেই চলে যায়। সামনে দাঁড়াতে ভয় করে, যদি মা সব ধরে ফেলেন, কতদিন যে বাড়ি যাই নি।

টিং টং ...টিং টং !!!!

চমক ভাঙল কলিং বেলের আওয়াজে, নিজের খেয়ালে কখন যে হারিয়ে গেছিলাম জানি না। ঘড়িতে ছটা চল্লিশ। খরিদ্দার এর আগমন ঘটলো নাকি ?

'হ্যাঁ, বলুন'।

-'বিক্রম বাবুর সাথে কথা হয়েছিল আমার, তুমিই শবনম'?

দরজায় দাঁড়িয়ে বছর পঞ্চাশের এক ভদ্রলোক ! বাব্বা, এই বয়েসেও চালু তো বেশ ! এরা বেশ মালদার পার্টি হয়।

-'আসুন, আসুন বাইরে দাঁড়িয়ে কেন'।

ভদ্রলোককে বসতে বলে ভেতরের ঘরে চেঞ্জ করতে এলাম। কেন জানি না, খুব চেনা চেনা লাগছে ভদ্রলোককে, কোথায় দেখে থাকতে পারি ! যাকগে, হবে হয়তো কোন পার্টিতে, অত ভেবে কাজ কি, ফেলো কড়ি মাখো তেল, সোজা হিসেব !

নীলচে শিফনের আবরণে যখন ড্রয়িং রুমে ঢুকলাম, দেখি ভদ্রলোক ইতিমধ্যেই সার্ট খুলে ফেলেছেন, খুব তাড়া দেখছি বাবুর !!

'কি দেখছেন অমন করে' ? হুইস্কির গ্লাসটা এগিয়ে দিতে দিতে বললাম।

-'তোমায় ! জানো, একজনের সাথে না, তোমার মুখের ভীষণ মিল'।

'হি হি, কার ? আপনার বউ এর বুঝি ?' কাঁধের ওপর থেকে আঁচলটা সরালাম।

পাক্কা এক ঘণ্টা পর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শাড়ির কুঁচি ঠিক করতে করতে আড়চোখে দেখলাম, ভদ্রলোক বিছানায় তখনো শুয়ে। সাময়িক ঝড়ের পর এখন চারপাশটা আগের মত শান্ত।

'কি ব্যাপার, বাড়ি ফেরার ইচ্ছে নেই বুঝি ?'

'ইচ্ছে তো নেই একদম ডার্লিং ! থেকেই যাই কি বল ?'

মৃদু হাসলেন ভদ্রলোক।

'আজ্ঞে তা হয় না স্যার, আপনি না গেলে চাপটা যে আমার হবে। নিন উঠুন'।

দু'হাজার টাকা গুনে হাতে নিলাম। যাক, বাড়িতে এটা পাঠিয়ে দেবো কালই।

'আমার কার্ডটা রাখো। দরকার হলে ফোন করো, হাজির হয়ে যাব'।

'থ্যাংকস, আবার আসবেন'।

বড্ড ধকল গেল আজ, এখন দরকার একটা ফ্রেশ শাওয়ার। বিক্রম কখন ফিরবে কিছুই বলেনি।

শাড়িটা ছাড়তে গিয়ে বিছানায় পরে থাকা কার্ডটার দিকে চোখ পড়লো...

ডঃ সুবিমল সেনগুপ্ত
১২/২ , তালতলা লেন, কোলকাতা -২০
০৩৩-৬৭২৫৭৯২

* * * * * * * *

'সেকি মশাই, আপনার স্ত্রী কতক্ষণ ধরে দরজা খুলছেন না ?'

'ডুপ্লিকেট চাবি নেই আপনার ?'

'না না, আর নয়, দরজাটা ভাঙতেই হবে, আপনারা একটু সাহায্য করুন' !!

* * * * * * * *

নমস্কার, এবিপি আনন্দে আপনাদের স্বাগত জানাই। এই মুহূর্তের শিরোনাম...

গলফগ্রীন এর ফ্ল্যাটে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী এক যুবতী। কোন সুইসাইড নোট পাওয়া না পাওয়ায় পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে স্বামী বলে পরিচয় দেওয়া যুবককে। ধন্দে পুলিশ। এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। ♦♦♦

চিত্রগ্রাহক - শুভঙ্কর ঘোষ

ও নদীরে...

জয় বাবা ফেলুনাথ

প্রয়াগের পুণ্য তোয়া

মঙ্গলালোকে

পাগলা হাওয়ার বাদল রাতে

সৌভিক ভট্টাচার্য্য

সব ক্লাসের দরজা-জানলা লাগিয়ে বাঙালিদা যখন হেডস্যার পরেশবাবুকে চাবির গোছাটা দিল, তখন ঘড়ির কাঁটা পৌনে পাঁচটা ছাড়িয়েছে। তাই আর পাঁচটা দিনের মত সেদিন স্কুল থেকে বেরোতে প্রায় পাঁচটা হয়ে গেল।

এই ফাঁকে বলে রাখি আমি অবিনাশ চৌধুরী, নিজুরী উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক। আমার বাড়ি মিলনপুরে নিজুরী থেকে তেরো কিমি দুরে। স্কুলে জয়েন করার দিনই বুঝতে পেরেছিলাম কপাল খারাপ। এমনিতেই বাড়ি থেকে বাসস্ট্যান্ড সাইকেল করে আসতে লাগে প্রায় পনের মিনিট। তারপর বাস ধরে নিজুরী আসতে পাক্কা এক ঘন্টা। স্কুলটা আবার নিজুরী বাসস্ট্যান্ড থেকে তিন মাইল দুরে। স্কুলের মাস্টারমশাইদের সবারই বাড়ি আশেপাশের গ্রামে। শুধু আমিই আসি মিলনপুর থেকে। পরেশবাবুর বাড়ি সুরি। উনি মোটরসাইকেলে আসেন। যেহেতু বাসস্ট্যান্ডে না আছে কোন রিক্সা না আছে কিছু তাই বাস থেকে নেমে একটু অপেক্ষা করি। পরেশবাবু এলে ওনার মোটরসাইকেলে চেপে রওনা দি। আবার আসার সময়ও পরেশবাবু আমাকে বাসস্ট্যান্ডে নামিয়ে দিয়ে চলে যান। বাস এলে আমিও রওনা দিই উল্টো দিকে।

বাসস্ট্যান্ড থেকে নিজুরী স্কুল পর্যন্ত রাস্তায় কোন ঘরবাড়ি বা দোকানপাট নেই। কেবল রাস্তার দুই ধারে আছে শিশু গাছ, নিম গাছ, আর তার পেছনে বিঘের পর বিঘে জুড়ে ধান খেত।

সেদিন যখন স্কুল থেকে বেরলাম, তখন পশ্চিম আকাশে ঘন কালো মেঘ জমে রয়েছে। বুঝলাম, কিছুক্ষনের মধ্যেই বৃষ্টি নামছে। বাসস্ট্যান্ডে আমাকে নামিয়ে পরেশবাবু চলে গেলেন। তার কিছুক্ষন পরেই বৃষ্টি নামল। মোটা মোটা জলের টোপ দেখে বুঝলাম, এই বৃষ্টি না থামলে কপালে দুঃখ আছে। তরিঘরি গিয়ে পাশের প্রতীক্ষালয়ে আশ্রয় নিলাম।

প্রতীক্ষালয় মানে বাসস্ট্যান্ডের ওয়েটিং রুম। ইটের তৈরি। পূব দিকে একটিমাত্র জানলা। শিক ভাঙা। সামনের দেওয়ালে লেখা,

‘প্রতিক্ষালয়’

দাঁড়াও পথিকবর

মাইকেলের কোটেশান দিতে ওস্তাদ এদিকে ‘সন্ধিজ্ঞান’ নেই। প্রতীক্ষালয়ের ভিতরের দেওয়ালে কতক হিন্দি বাংলা ছবির পোস্টার আর জলধর বিড়ির বিজ্ঞাপন।

আধঘন্টা হয়ে গেল এখন বাস এলো না। প্রতিদিন ‘পথের-অতিথি’ পাই। এতক্ষন চলে আসার কথা ছিল। অবশ্য হাটজন-বাজারে দানাপুর এক্সপ্রেস এর প্যাসেঞ্জার নিয়ে আসতে প্রায়ই লেট হয়। আমাদের দেশের ট্রেনগুলো তো কোন কালেই পাঙ্কচুয়াল নয়। ট্রেনের জন্য বাসের লেট। বাসের জন্য লোকজনের লেট। আর সব মিলে দেশের লেট।

এদিকে বৃষ্টি বেড়েই চলেছে। তারপর শুরু হল প্রচণ্ড শব্দে ঝড় ও বজ্রপাত। গ্রীষ্মের বিকেল পাঁচটাকে সন্ধ্যে সাতটা মনে হচ্ছে। এদিকে বাসের দেখা নেই। টিনের চালে বৃষ্টির শব্দে আর বিদ্যুৎ চমকানোর আওয়াজে, বাইরের কিছুই শোনা যাচ্ছে না। ব্যাগ থেকে মোবাইলটা বের করে, পথের অতিথির কন্ডাক্টর খোকনদাকে ফোন লাগালাম।

ও প্রান্ত থেকে আওয়াজ এল, “হ্যাঁ , হ্যালো, কে ?”

--“আমি আবিনাশ বলছি গো খোকনদা। কি গো আজ বাস নেই নাকি ? কতক্ষন ধরে বসে আছি।”

--“কেনে ? জান না এখানকার অবস্থা ? হরিপুরে গাছ ভেঙে ব্রিজের ওপর পরেছে তার পর আবার ঝড় বৃষ্টি। ভাবছি সুরি ফিরে যাব।”

--“যাহ ! তাহলে এখন কি করব ?”

--“দেখ কোন মোটরসাইকেল-টাইকেল পাও কিনা। আজকে আর বাস যেছে না”, ফোন টা কেটে দিল খোকনদা।

হরিপুরের ব্রিজটাকে ব্রিজ না বলে সেতু বলাই ভাল। নিচে ক্যানালের জল বয়ে যায়। অদুরে ছোট্ট একটা সাইনবোর্ড, তাতে লেখা– ‘দুর্বল সেতু। গাড়ি আসতে চালান।’

এই দুর্যোগের দিনে কেই বা বাইক নিয়ে বের হবে। অতএব কপালে অসীম দুর্ভোগ। গোটা রাতটাই যে এই প্রতীক্ষালয়ের অন্ধকারে মশার কামড়ে কাটাতে হবে তাতে আর কোন সন্দেহ রইল না।

চারিদিক একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল। তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ল বৃষ্টির বেগ। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও এক জনমানবের দর্শন পেলাম না। বাড়িতে বোধহয় মা চিন্তা করতে শুরু করেছেন। তিনি যদি জানতে পারেন, এই ঝড় জলের রাত্তিরে আমি এখানে রাত কাটাচ্ছি, তাহলে তাঁর খাওয়া দাওয়া মাথায় উঠবে। অগত্যায় মাকে ফোন করে বললাম, ঝড় বৃষ্টিতে পরেশবাবু বাড়ি ফিরতে দিলেন না। তাই ওনার বাড়িতে আছি।

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ছটা বেজে গেল। বৃষ্টি থামার কোন লক্ষ্যই নেই। বাইরে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক আর ব্যাঙের ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর শুরু হল। এদিকে পেটে খিদে, পেট জ্বলছে। ব্যাগ হাতড়ে এক প্যাকেট বিস্কুট আর চিপস্ ছাড়া আর কিছুই পেলাম না। একখানা সিগারেট ধরালাম। আজ যে কার মুখ দেখে উঠেছিলাম।

বাইরের ঘুটঘুটে অন্ধকারে মাঝে মধ্যে কেবল গুড়গুড় বিদ্যুৎ চমকানোর আলোতে চারপাশটা আলোকিত হয়ে উঠছে। সেকেন্ড খানেক বাদে আবার যে কে সেই। খানিকক্ষণ মোবাইলে গেম খেলার পর সেটাও টিং-টিং শব্দে ব্যাটারি লোয়ের জানান দিতে লাগলো।

তখন আন্দাজ আটটা হবে। বৃষ্টিটা সবে থেমেছে। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে থাকতে থাকতে একটু তন্দ্রা এসে গেছিল। এমন সময় বাইরে জলের ওপর পা ফেলার মত ছপ্ ছপ্ শব্দ শুনলাম। ভাবলাম হয়ত মনের ভুল। কিন্তু পরক্ষনেই দেখলাম একটা ছায়ামুর্তি খানিকটা দ্রুতগতিতে ভিতরে ঢুকল। আর ঠিক সেই সময় ভয়ানক শব্দে বিদ্যুৎ চমকাল। তার আলোয় স্পষ্ট দেখলাম একজন ভদ্রলোক।

বয়স ষাট-বাষট্টি হবে, মাথায় টাক, চোখে চশমা, পরনে ধুতি আর সার্ট। ইনি আবার এই সময় কোথা থেকে এসে হাজির হলেন !

আবার চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল।

--"বলি কতক্ষন এভাবে আটকে পরে রয়েছ ?", নাকিসুরে প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক।

--"আজ্ঞে, সে বিকেল পাঁচটা থেকে। কিন্তু এই ঝড় জলে আপনি কোথায় ছিলেন এতক্ষন ?", অবাক হয়ে প্রশ্ন করি আমি।

--"তোমাদের বাপু বড্ড খোঁজ সবকিছুতে", বলে আমার পাশে বসলেন তিনি, "নতুন জয়েন করেছ নাকি হে ?"

--"হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কি করে জানলেন ?"

--"আদ্দিন ধরে মাস্টারি করছি, ইশকুলের খবর জানব না ?"

--"আপনিও এই স্কুলের টিচার নাকি ? কিন্তু কই, আপনাকে তো এই স্কুলে আগে কখনো দেখিনি", বললাম আমি।

ভদ্রলোক বোধহয় চটে গেলেন, "দেখনাই বলেই যে নই তার কি কোন মানে আছে নাকি ? ভুত দেখেছ, ভুত ? দেখনি। তাই বলে যে ভুত প্রেত কিছু নেই তার গ্যারান্টি আছে ?"

আমি বললাম, "না না। আসলে আগে কোনদিন তো আপনাকে দেখিনি তাই। আপনার নামটা তো বললেন না..."

--"ও। নিশিকান্ত সামন্ত, ইতিহাসের টিচার। তোমার সাবজেক্টটা কি যেন ?"

--"আমার অঙ্ক।"

ছমাস হল জয়েন করেছি। এনাকে একদিনও দেখিনি। হয়তো রিটায়ার করে গেছে।

--"আপনার সাথে দেখা হয়ে ভালই হল। সেই বিকেল থেকে বাস চলছেনা জানেন নিশ্চয়ই। গোটা রাতটা একা কাটাতে হলে আরও মুশকিল হত"।

--"হুম্। সেদিনও বাস ছিল না", নিশিকান্তবাবুকে কেমন অন্যমনস্ক লাগল।

--"কোনদিনের কথা বলছেন ?", আমি জিজ্ঞেস করলাম।

--"সে আরেক গল্প বুঝলে ? শুনবে নাকি ?"

--"হ্যাঁ মানে গল্প হলে তো ভালই হয়। বলুন না", আমি বললাম। গল্প শুনতে আর কার না ভাল লাগে ? তাছাড়া এভাবে চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে গল্প শোনা ঢের ভাল।

ইতিমধ্যে বৃষ্টিটা আবার বেড়েছে। আমি বাবুমিলে বসলাম। নিশিকান্তবাবুকেও বেশ উৎসাহিত দেখাল। তিনি এক পায়ের ওপর আরেক পা চাপিয়ে জুত করে বসে গল্প শুরু করলেন।

--"তোমাকে তো বললামই, আমি ইতিহাসের মাস্টার। তখনকার দিনে তো আর এত এত ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করত না, এত টিচার ও জয়েন করে নাই। ছটা না সাতটা রুম ছিল গোটা ইশকুলটায়।

"তবে জান কি, ইতিহাস বিষয়টাকে আমি প্রাণাধিক ভালবাসতাম। আমার মতে এরকম ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট আর হয় না। ছেলে-মেয়েদেরকে ইতিহাস পড়াতে গিয়ে নিজেকে একেবারে উজাড় করে দিতাম বুঝলে !"

"যাই হোক। অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছিলাম। গল্পে ফিরে আসি। সেদিন ইশকুল থেকে বেরোতে খানিক দেরি হয়ে গেছিল। ক্লাস টেনের রেজিস্ট্রেশান ছিল আর কি। মাথায় মেঘ নিয়ে বেরলাম। বর্ষা তখনও শুরু হয়নি। আর ডাক্তারের কথামত ইশকুল থেকে বাসস্ট্যান্ড অবধি হেঁটেই মেরে দিতুম। পুরো ছটায় বাস। হেঁটে আসতে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মত লাগত। যখন বাসস্ট্যান্ড পৌঁছুলাম তখন বাজে ছটা পনের।

"তখনকার দিনে অবশ্য এত বাসের রমরমা ছিল না। ওইটেই ছিল লাস্ট বাস। এদিকে আকাশে কালো মেঘ ঘনিয়ে আছে। এই যে প্রতীক্ষালয়, তখন সবে সেটা তৈরি হয়েছে। এতেই ঢুকলুম। ভাবছি কি করব এমন সময় ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। ভাবলুম এখানেই রাত্রিযাপন, ঠিক তোমার মতই আর কি। হে হে"।

খানিকক্ষণ থামলেন নিশিকান্তবাবু চশমাটা নাক অবধি নেমে গেছিল। ওটা ওপরে তুলে ঝোলা সার্টের পকেট থেকে সিগারেটের কৌটো বের করলেন। সেখান থেকে একটা সিগারেট মুখে পুরে আমার দিকে চাইলেন, "তোমার দেশলাই বাক্সটা দাও তো একবার।"

যা ব্বাবা! উনি কি করে জানলেন যে আমি স্মোক করি ? যাই হোক পকেট থেকে দেশলাইয়ের বাক্সটা দিলুম। তিনটে মাত্র কাঠি পরে ছিল।

বৃষ্টি ততক্ষণে থেমে এসেছে। আকাশে কোদাল কাটা মেঘের মধ্যে দিয়ে একখানি চাঁদ উঁকি মারছে।

একটা কাঠি নিয়ে সিগারেট ধরিয়ে বাক্সটা আমায় ফেরত দিলেন। তারপর লম্বা একখানা টান দিয়ে, মুখ থেকে একরাশ ধোঁয়া বের করে আবার শুরু করলেন।

--"হ্যাঁ। যা বলছিলুম। খানিকক্ষণ বসে বসে কাটিয়ে দিলুম বুঝলে। কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে যেন একটা হই-হট্টগোলের আওয়াজ কানে এল। আমি ভাবলাম এই ঝড়-বাদলের রাতবিরেতে আবার কাদের চিৎকার।

"এই যে মোরাম রাস্তাটা পাকা রাস্তা থেকে নিজুরি ঢুকেছে, এই রাস্তা তখন ছিল। আমি কান পেতে রইলাম, আর মনে হল শব্দটা যেন এই দিকেই এগিয়ে আসছে আস্তে আস্তে। খানিক পরে দেখলুম পাঁচ-ছয়জন হোমরাচোমড়া লোক এসে ঢুকল এইখানে। প্রত্যেকের হাতেই একটা করে লাঠি। একজনের হাতে বস্তার মত কি যেন ছিল। সেই লোকটা তাঁর ওই বস্তা থেকে একটা মোটামত কাপড় জড়ানো লাঠি বের করল। তারপর যখন সেটাতে আগুন জ্বালালো, তখন আর কিছু বুঝতে বাকি রইল না। ওটা মশালই বটে। ওদের কথাবার্তা শুনে বুঝলাম, পাশের গাঁয়ে ডাকাতি করে ফেরার পথে, বৃষ্টি নামায় ওরা আশ্রয়ের খোঁজে এখানে ঢুকেছে। বাকিদের মুখগুলো এবার স্পষ্টভাবে দেখতে পেলুম। একজন দেখলুম পাশে সিন্দুকের মত বড় বাক্স নামিয়ে রাখল। এতক্ষন ওরা কেও আমায় দেখতে পায়নি। প্রথম মশাল হাতে থাকা লোকটাই আমায় দেখল। এইই বোধহয় এই ডাকাত দলের সর্দার। দেখে শুনে মনে হল ভালই দাঁও মেরেছে।

সর্দার ব্যাঙ্গের সুরে আমায় প্রশ্ন করল, "কি গো বুড়ো। এত রাতে তুমি এখানে কি করছ ?"

--"ভদ্রভাবে কথা বলতে শেখনি নাকি ? অন্ধকারে ডাকাতি করে বেড়াচ্ছ হতভাগা।"

ওই লোকটা আর তার সাকরেদগুলো তখন খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতে লাগল। মশালের আলোয় এবার সর্দারের মুখটা ভাল ভাবে দেখতে পেলাম। বললে বিশ্বাস করবে না ওর মুখটা, ওর পাগড়ি পড়া মুখটা একদম ভগৎ সিংএর মত দেখতে। একদম হুবহু"।

আমি হেসে ফেললাম। ডাকাতের সর্দারের মুখের সাথে ইতিহাসের মাস্টার ভগৎ সিং -এর মিল খুঁজে পেলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, "তারপর ?"

--"আমি রেগে গিয়ে বললাম, 'ইশকুলে তো পড়াশোনা কর নাই। নইলে কি আর এরকম ডাকাতি করে পেট ভরাতে হয়। কিন্তু তুমি কি জানো, তোমার মতই দেখতে আর একজন আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে পরাধীন ভারতকে স্বাধীন করতে, নিজের প্রাণ দান করেছিল ?', ইতিহাসের ভুত মাথায় চেপে বসলো।

ওস্তাদ বলে কি জানো ? সে আমাকে বলে, 'সে কে গো, তোমার বাপ নাকি ?'

"আমি রাগের বশে কান্ডজ্ঞান হারিয়ে দিলাম ওর দুই গালে ঠাটিয়ে দুটো চড় কষিয়ে। রাগে, অপমানে সর্দারের মুখ লাল হয়ে গেল। একে ডাকাত দলের সর্দার তারওপর দলের সবার সামনে এভাবে চড় খেল। ও কি করল জান ? মাটি থেকে ওর নিজের চক্‌চকে লাঠিটা তুলে দিল আমার মাথায় এক ঘা বসিয়ে"।

--"এ কি !", আমি চিৎকার করে উঠলাম।

নিশিকান্তবাবু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "দাঁড়াও দেখবে কেমন করে", বলে কোত্থেকে এক লাঠি নিয়ে নিজেই নিজের মাথায় সজোরে আঘাত করলেন। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না ঠিক। জানলা দিয়ে আসা চাঁদের আলোয় দেখলাম, তাঁর মাথা থেকে গলগল করে তাজা রক্ত মাটিতে পড়ছে। উনি বললেন, "এইটাই সেই লাঠিটা। আর ওখানেই স্পট ডেড। ভাবতে পারো ইতিহাস শেখাতে গিয়ে..."

আমার আর কিছু মনে নেই। মাথাটা কেমন ঘুরছিল। মাটিতে পড়ে গেলাম ধপাস করে।

যখন পরের দিন জ্ঞান ফিরল, ঘড়িতে দেখি দশটা বেজে পাঁচ। পূব আকাশে সূর্য্যি ওঠার পূর্ব মূহূর্ত। ঝকমকে সকাল দেখে আগের রাতের কথা কিছু মনে পড়ে না। তড়িঘড়ি প্রতীক্ষালয় থেকে বেড়িয়ে এলাম। মিনিট পনেরোর মধ্যে বাস মিলল। তাতে চেপে সোজা বাড়ি।

বাড়িতে কাউকে কিছু বললাম না। স্কুল যাওয়া তো দুরের কথা, কোন কাজেই মন বসছিল না। নিশিকান্তবাবুর মাথা ফেটে রক্ত পড়ার দৃশ্যটা বারবার মনে পড়ছিল।

পরদিন সক্কাল সক্কাল বাস ধরে স্কুলে পৌছুলাম। চার পিরিয়ডের পর টিফিনের ঘন্টা পড়লে, স্কুলের জাম গাছটার নিচে বসে, পরেশবাবুকে সব কিছু খুলে বললাম। সব শুনে তো তার মাথায় হাত। "মাই গড ! আবার একবার"।

--"আবার একবার মানে ?"

--"আরে বাবা তোমার ভাগ্য ভাল যে তুমি বেঁচে ফিরে এসেছ। তোমাকে প্রথম থেকেই বলি তাহলে।

"আসলে আজ থেকে বছর দশেক আগে নিশিকান্তবাবু এই স্কুলের টিচার ছিলেন। হ্যাঁ, ইতিহাসকে উনি খুব ভালবাসতেন... সত্যি কথা বলতে ওনার মত ইতিহাসের টিচার আমারা আগে কখনো পাইনি। বয়স অনেক হলেও মনে মনে যুবক ছিলেন ভদ্রলোক। পরশুর মতই একদিন স্কুল থেকে বেরোতে দেরি হয়ে যায় ওনার। বার বার বলা সত্ত্বেও, উনি আমার বাড়ি এলেন না। বিকেলের দিকে খালি একটামাত্র বাস যা যেটা ছিল সেটাও পেলেন না, উপরন্তু ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। তখন আবার গাঁয়ে-গঞ্জে মাঝে মাঝে ডাকাতি হত। ঘটনাচক্রে ডাকাতগুলো ওনার মত প্রতীক্ষালয়ে আশ্রয় নিলেন। পরের দিন গ্রামের সকলে নিশিকান্তবাবুর রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখে, পুলিশে খবর দেয়। সবাই আন্দাজ করেছিল ডাকাতদের হাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু ভিতরের ব্যাপার যে এই তা কেও জানত না।

"এরপর নিশিকান্তবাবুর জায়গায় লাভপুর থেকে, জয়েন করলেন বাসুদেববাবু। কালবৈশাখীর বিকেলে তাকেও একইভাবে আশ্রয় নিতে হয়েছিল ওই প্রতীক্ষালয়ে। সকালে বাস কন্ডাক্টর তাকে একইভাবে মরে পড়ে থাকতে দেখে। সে রহস্যের কিনারা আজও হয়নি।

"তারপর থেকে বাইরের আর কোন টিচারকে, এই স্কুলে জয়েন করানো হয়নি। কেবলমাত্র আমি ছিলাম। এর অনেকদিন পর তো তুমি এলে।

"আমার মনে হয় যে নিশিকান্তবাবু ইতিহাসকেই তাঁর মৃত্যুর কারণ হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন। আর সেজন্যই ইতিহাসের উপর তীব্র বিতৃষ্ণা জন্মে গেছিল তাঁর। বাসুদেববাবুকে হত্যা করার কারণ হয়তো বাসুদেববাবু ইতিহাসের শিক্ষক বলেই। কিন্তু তুমি তো হিস্ট্রির লোক নও। তাই তোমার মাথায় আঘাত না করে তিনি নিজের মাথাতে আঘাত করেছিলেন। অবশ্য এসবই আমার অনুমান। তোমার ভাগ্য ভাল ভাই। এই যাত্রায় তুমি বেঁচে গেলে। আজ থেকে তুমি একটু তাড়াতাড়ি স্কুল থেকে বেরোবে, কেমন ?"

পরেশবাবু অনুরোধ করলেন এই ব্যাপারে কাউকে কিছু না বলার জন্য। পরেশবাবু উঠে গেলেন। আমি আরও কিছুক্ষন বসে রইলাম জাম গাছটার নিচে। গোটা ঘটনাটাই যেন এক দুঃস্বপ্নের মত ঠেকছে। খানিক বাদে পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে দেশলাইয়ের বাক্সটা খুললাম। দেখি তিন-তিনটে কাঠিই পড়ে রয়েছে। নিজের ব্যবহৃত কাঠিটাকেও অক্ষত রেখে মৃত্যু পরবর্তী জীবনের শেষ চিহ্নটুকুও নিশ্চিহ্ন করে গেলেন নিশিকান্তবাবু। ♦♦♦

চিত্রশিল্পী - দীপান্বিতা ভট্টাচার্য

টম এন্ড জেরি